Registered No. 56

অসতো মা সদগময়,

তমসো মা জ্যোতি র্গময়,

মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৫ ভাগ
৯ম সংখ্যা।

১লা ভাদ্র, বুধবার ১৩৩৯, ১৮৫৪ শক,
ব্রাহ্মসংবৎ ১০৩
17th August, 1932.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

শরণ *

অগতির গতি ঐ অভয় চরণ,
আমি যে অনন্যগতি লইনু শরণ।
ভ্রমেছি অনেক পথ,— দুয়ারে দুয়ারে কত,—
কেহ ডাকিল না ঘরে ফিরা'য়ে নয়ন।
কত ব্যথা পেয়ে পেয়ে, কত ঘৃণা স'য়ে স'য়ে,
ভাঙ্গিয়াছে এত দিনে সংসার-স্বপন।
আঁখি আজি জলে ভরা, কা'র বুকে ঢালিবে ধারা?
কোথা হবে, এ দুঃখের ব্রত-উদ্‌যাপন?

হে প্রেমময় পিতা, তুমি যে আমাদিকে শুধু এই সংসারে আনিয়াছ, তাহা নহে; আমাদের অনন্ত উন্নতি ও কল্যাণের জন্য, তোমার মহান্ ধর্ম্মের উচ্চ তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়া, আমাদিগকে তাহার আশ্রয়েও ডাকিয়া আনিয়াছ। দুঃখের বিষয়, ইহার মধ্যে যে তোমার কি অপার করুণা রহিয়াছে, আমাদের শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমাদিগকে যে কি উচ্চ অধিকার প্রদান করিয়াছ, তাহা আমরা এখনও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। নতুবা, তোমাকে সাক্ষাৎ ভাবে জানিবার ভালবাসিবার ও অনুসরণ করিবার এমন সুযোগ পাইয়াও, আমরা কখনও তাহা হেলায় নষ্ট করিতাম না,—তোমার পূজার বিষয়ে এত উদাসীন থাকিতাম না। হে হৃদয়দর্শী দেবতা, তুমি আমাদের ত্রুটি দুর্ব্বলতা সকলই দেখিতেছ, বাহিরের কোনও আবরণ দ্বারা তোমার নিকট কিছুই লুক্কায়িত রাখা যায় না। তবুও তোমার অপার প্রেমেই তুমি আমাদিগকে আবার তোমার পবিত্রধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার উৎসবে আহ্বান করিতেছ। তুমি কৃপা করিয়া এবার আমাদের জীবনে তোমার সত্য পূজা প্রতিষ্ঠিত কর, আমাদের প্রতি জীবনে তোমার জীবন্ত ধর্ম্মকে মূর্ত্ত করিয়া তোল। আমাদের মলিন জীবন দ্বারা যেন আমরা আর আমাদের নিজের ও অপর সকলের অকল্যাণ সাধন না করি, তোমার পবিত্র ধর্ম্মের অগৌরব ঘোষণা না করি। আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমার হইয়া যাই। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক।

* ভৈরবী—ঝাঁপতালে গীত হইতে পারে।

চয়ন

(মার্কাস অরিলিয়সের উক্তি।)

১। সুনীতি, আত্মশাসন, বিনয় এবং সাহসিকতা অভ্যাস কর।

২। ভগবদ্ভক্তি এবং পরোপকারিতা শিক্ষা কর, এবং কেবল পাপকর্ম্ম হইতে নয়, কিন্তু পাপচিন্তা হইতেও, নিবৃত্তি শিক্ষা কর।

৩। স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা উপার্জ্জন কর। দৃঢ় এবং কোমল উভয় গুণই ধারণ করিবে।

৪। কাহারও প্রতি কখনও রাগ প্রকাশ করিবে না, এবং রাগবিবর্জ্জিত হইয়া সকলের প্রতি স্নেহশীল হইবে।

৫। কোনও ঘটনায় বিপথগামী হইও না। সকল অবস্থায়—এমন কি পীড়ার অবস্থাতেও,—মনের প্রফুল্লতা রক্ষা কর।

৬। চরিত্রে মধুরতা ও গাম্ভীর্য্য উভয় মিশ্রিত করিয়া

রাখ, এবং তোমার বর্ত্তমান কর্ত্তব্য অবিচলিতচিত্তে সাধন কর।

৭। তোমার কোন কার্য্যে মন্দ অভিসন্ধি রাখিও না। কোন কার্য্য ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিও না। কখনও বিরক্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িও না। কখনও ক্রুদ্ধ ও সন্দিগ্ধচিত্ত হইও না।

৮। নম্রপ্রকৃতি হও। সুবিবেচনাপূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছ, তাহাতে অটল থাক। পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে যত্নশীল হও। সকল সময়ে প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট থাক, এবং আত্মশাসনে মনোযোগী হও।

সম্পাদকীয়।

ভাদ্রোৎসব—ব্রাহ্মসমাজের—তথা জগতেরও—ইতিহাসে, ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র (১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট) তারিখ একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। এই দিবসে, বিশ্ববিধাতার নিগূঢ় বিধানে, রাজর্ষি রামমোহন, সুদীর্ঘ কাল অতি নিষ্ঠার সহিত স্বীয় হৃদয়ে পোষিত, গভীর সাধনালব্ধ, যে উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্মের বীজ, এই দেশের ও জগতের কল্যাণের জন্য, কলিকাতা নগরীর একটি ক্ষুদ্র কক্ষে সমবেত কতিপয় বন্ধুর হৃদয়ে প্রকাশ্য ভাবে বপন করেন,—সত্যে ও ভাবে এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের সম্মিলিত পূজার উদ্দেশে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন,—তাহার অন্তর্নিহিত অনন্ত সম্ভাবনা সে সময় কেহই সম্যক্ ধারণা করিতে সমর্থ হয় নাই; এখনও যে আমরা তাহা করিতে পারিয়াছি, এমন কথাও বলা যায় না। তাহাতে ইহার গৌরব ক্ষুণ্ণ না হইয়া বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিতই হইয়াছে মনে হয়।

নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই তাঁহাকে এই কার্য্য সাধন করিতে হইয়াছিল। এবং যথোচিত পরিচর্য্যার দ্বারা উহাকে উপযুক্তরূপে বিকশিত করিবার পূর্ব্বেই, তিনি অন্যত্র আহূত হন। অঙ্কুরিত হইতে না হইতে নানা জঞ্জালরাশি উহাকে আবৃত করিয়া ফেলিলেও, করুণাময় পিতার মঙ্গল ব্যবস্থাতে, কিছুই উহার বিনাশ সাধন করিতে পারে নাই। বিবিধ বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও, উহা ধীরে ধীরে অনন্ত উন্নতি ও বিকাশের পথেই চলিয়াছে। কেন না, কোনও ব্যক্তি বা গ্রন্থ বিশেষের উপর এই ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই। জীবন্ত দেবতার সাক্ষাৎ সত্য পূজাই উহার প্রাণ ও মূল ভিত্তি। ইহার মধ্য দিয়াই, প্রত্যেক মানুষ, সত্যস্বরূপ হইতে, সাক্ষাৎ ভাবে, চিরদিন সমস্ত সত্য লাভ করিয়াছে ও করিবে। কাজেই রাজর্ষির অধিকাংশ শিক্ষা সে সময় ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিতে না পারিলেও, এবং কিছু দিনের জন্য এক প্রকার লুপ্ত হইলেও, তাঁহার ধর্ম্ম এই একটি মাত্র ব্যবস্থার বলেই বাঁচিয়া রহিয়াছে এবং বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। সে ব্যবস্থাও যে অতি অপূর্ণ ভাবেই গৃহীত হইয়াছিল, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ হইতে পারে নাই, তাহা আমরা আজকাল সকলেই অবগত আছি। তথাপি, সেই বীজ হইতে যে এরূপ সুফলপ্রসূ সতেজ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিশ্ববিধাতার জীবন্ত কার্য্যই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভবিষ্যতে যে আরও কত বিকশিত হইবে, কিরূপ অসংখ্য সুফল প্রসব করিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। এই জন্যই ৬ই ভাদ্রের তুল্য স্মরণীয় দিন আর নাই। এই দিন স্মরণ করিয়া আমাদের হৃদয় যে কিরূপ কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হওয়া উচিত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমরা বহুকাল এই দিনের কথা ভুলিয়াই ছিলাম। মাত্র কয়েক বৎসর যাবৎ আমরা এই উপলক্ষে সামান্য ভাবে উৎসব করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের এই প্রচেষ্টা যে নিতান্তই অপ্রচুর হইয়াছে, তাহা আমরা দিন দিনই অনুভব করিতেছি। এই হেতু, এবার একটু দীর্ঘকালব্যাপী কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করা স্থির হইয়াছে। কিন্তু ইহাই যে যথেষ্ট নহে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। দীর্ঘকালব্যাপী হইলেই যে উৎসব অবশ্যম্ভাবীরূপে সফল হইবে, এমন কথা কেহ বলিবে না। উহার সফলতাসাধনের জন্য সকলকে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা ও আকুল প্রার্থনা লইয়া উৎসবক্ষেত্রে সমবেত হইতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ হইতে, ব্রহ্মোপাসনা হইতে, আমরা জীবনে কি সম্পদ্ লাভ করিয়াছি, তাহা একবার স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে আমাদের হৃদয় গভীর কৃতজ্ঞতাতে পূর্ণ না হইয়া পারে না। আর, ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে থাকিয়া, সত্য প্রাণপ্রদ ব্রহ্মোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া, আমরা কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, তাহা একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, নিশ্চয়ই প্রাণে তীব্র দুঃখ বেদনা ও আকুল প্রার্থনা জাগিবে। যাহা পাইয়াছি তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা যতই গভীর হইবে, যাহা পাই নাই বা হারাইয়াছি তাহার জন্য বেদনা ও প্রার্থনা ততই প্রবল হইবে। এক হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও প্রার্থনা, এবং দুঃখ বেদনা অনুতাপ, অপর হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া পরস্পরের ভাবকে যে বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিবে, তাহা বলা বাহুল্য। তাহার পরিচয় আমরা বহু উৎসবে ও সম্মিলিত উপাসনাতে পাইয়াছি। সুতরাং এ বিষয়ে যে আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের প্রতি এবং অপরের প্রতি একটা বিশেষ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেকের যথোচিত চেষ্টা যত্ন ব্যতীত উৎসব কখনও সম্যক্ প্রকারে সফল হইতে পারে না।

আমরা প্রত্যেকেই যেমন উৎসবের সফলতা বিষয়ে কিছু না কিছু সাহায্য করিতে পারি, তেমনি আমাদের উদাসীনতা অবহেলা, অন্তর্নিহিত হিংসা বিদ্বেষ অহঙ্কার, কপটতা বিরোধিতা প্রভৃতির দ্বারা যে গুরুতর প্রতিবন্ধকতাও উপস্থিত করিতে পারি, বিফলতারও কারণ হইতে পারি, সে কথাও আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে। তাহা যে সকলের পক্ষেই বিশেষ অনিষ্টকারী তাহা অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, আকুল আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও তত ক্ষতি হয় না, যদি অন্ততঃ কিছু পাই কি না তাহা

দেখিবার সরল ইচ্ছাটাও প্রাণে থাকে। সমালোচনাপ্রিয়তার স্থায়, সরল অনুসন্ধিৎসাটা দোষাবহ নহে। সুতরাং এই ভাব লইয়া উপস্থিত হইলে, উৎসবের সফলতা বিষয়ে কোনও প্রকার সাহায্য না করা হইলেও, বিরোধিতা করা হয় না। আর, ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা লইয়া উপস্থিত হইতে পারিলে যে ফল পাওয়া যায়, তাহা ইহার দ্বারা লব্ধ না হইলেও, নিশ্চয়ই নিজের কিছু উপকার সাধিত হয়, কোনও প্রকার অনিষ্ট উৎপন্ন হয় না। সুতরাং, উৎসব ও ব্রহ্মোপাসনার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যাঁহাদের কোনও অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহারা অন্ততঃ এই ভাব লইয়াও উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারেন। তখন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, ইহা হইতে সত্যই কিছু উপকার পাওয়া যায়, প্রত্যেকের জন্যই ইহার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে।

আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোক অনেক আছে। তাহাদের হৃদয়ে ইহার আবশ্যকতা বিষয়ে সরল সন্দেহ থাকিতে পারে। এরূপ সন্দেহটা অপরাধজনক নহে। ইহা উৎসবে উপস্থিত না হইবার সঙ্গত কারণও নহে। বরং, সন্দেহ দূর হয় কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যও তাহাদের উপস্থিত হওয়া উচিত। তাহা না করাই অন্যায়। সেই সন্দেহ দূর করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়াই যদি তাঁহারা একবার উপস্থিত হন, তবে তাহা সহজেই ভঞ্জন হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। আমরা অনেকেই জীবনে ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। তাঁহারাও যে পাইতে পারিবেন, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। এই হেতু, উৎসবক্ষেত্র হইতে তাঁহাদের দূরে থাকিবার কোনও সমুচিত কারণ দেখা যায় না। শুধু এই টুকু মনে রাখিতে হইবে যে, উহা অপেক্ষা কোনও ক্ষুদ্রতর ভাব লইয়া উপস্থিত হইলে নিজের ও অপরের মহা অনিষ্টের কারণ হইবে। কল্যাণকর নূতন সত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টাও একটা প্রধান কর্ত্তব্য।

আমরা সকলেই জানি, প্রাণহীন মিথ্যা অনুষ্ঠান ও বাহ্যিক আড়ম্বর, এই দেশের ধর্ম্মের মহা অনিষ্টসাধন করিয়াছে। তাহাদের হস্ত হইতে ধর্ম্মকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। সত্যে ও ভাবে প্রত্যক্ষ রূপে পরব্রহ্মের উপাসনা-প্রতিষ্ঠাই উহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য—একমাত্র বলিলেও ক্ষতি নাই, কারণ অপর সমস্তই উহা হইতে উৎপন্ন। প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য উভয়কে লইয়া উপাসনা। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, উহার বাহিরে কিছু নাই, সমস্তই উহার অন্তর্গত। আমাদের এই উপাসনাও যে প্রাণহীন মিথ্যা অনুষ্ঠানে ও বাহ্যিক আড়ম্বরে পরিণত হইতে পারে, এবং সময় সময় সেরূপ হইয়াও থাকে, তাহা ভুলিয়া থাকিলে কিছুতেই চলিবে না; সে কথা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া আমাদিগকে সাবধান ও সতর্ক থাকিতে হইবে। ইহার অভাবে আমাদের নিজের যেমন মহা অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে, তেমনি এই মহান্ ধর্ম্মের গৌরবও বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হয়। যাহারা কোন দিন সাময়িকভাবে এরূপ উপাসনায় উপস্থিত হন, তাঁহারা আকৃষ্ট না হইয়া চিরদিনের জন্য ইহার উপর বীতশ্রদ্ধই হইয়া যান। এই জন্যই এ বিষয়ে সর্ব্বদা সজাগ থাকা একান্ত আবশ্যক।

উপাসনা সকল দিন সমান পরিমাণে সরস ও প্রাণস্পর্শী না হইতে পারে,—অনেক সময় একেবারে শুষ্ক নীরসও হইতে পারে; কেননা, তাহা সকল সময় আমাদের চেষ্টা যত্নের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু শুষ্ক নীরস বলিয়াই যে উহা অনিষ্টকর হইবে, বা অপরের হৃদয়ে অশ্রদ্ধা জন্মাইবে, অথবা সরল ও সত্য না হইয়া মিথ্যা ও কপট বাহ্যিক আড়ম্বরে পূর্ণ হইবে, এমন কোনও কথাই নাই। মিথ্যা ও অসরল হইলেই অনিষ্টকর হয়, অশ্রদ্ধা জন্মায়। মিথ্যার দ্বারা লোককে সাময়িক ভাবে ভুলান সম্ভবপর হইলেও, কখনও তাহাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাকে স্থায়ীরূপে আকর্ষণ করা যায় না; মিথ্যা সময়ে প্রকাশিত হইয়া পড়িবেই, কিছুতেই দীর্ঘকাল লুক্কায়িত থাকিবে না। এই হেতু সরসতা যতই বাঞ্ছনীয় হউক না কেন, তাহার অপেক্ষা সত্যতার দিকেই অধিকতর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সরসতা থাকে খুবই ভাল। না থাকিলেও তত বেশী ক্ষতি নাই।

মিথ্যা যেমন আমাদের জীবনকে অধঃপতিত করে, তেমনি অপরেরও অনিষ্টসাধন করে। এই জন্যই উপাসনার মধ্যে মিথ্যাকে সর্ব্বপ্রকারে পরিহার করিতে হইবে। এই হেতু উপাসনার মধ্যে আমাদিগের দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণভাবে অন্তরে নিবদ্ধ করিতে হইবে, যাহাতে আমাদের উপাসনা সর্ব্বদা সরল ও সত্য হয়। বাহিরের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি প্রদান করিলেই, বিন্দু পরিমাণেও প্রদর্শনেচ্ছা থাকিলেই, তাহা মিথ্যা ও অসরল হইয়া যাইবে। পাণ্ডিত্য বা বাগাড়ম্বর প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিতে গেলেও মিথ্যা ও অসরল হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে। তাহাদের দ্বারা কাহারও মধ্যে উন্নত জীবন সঞ্চার করা যায় না। জীবনই জীবন দিতে পারে। নিজে প্রকৃত জীবন লাভ করিতে না পারিলে সবই বৃথা। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, আমাদের উৎসব যে অনেক সময় ব্যর্থ হয়, এবং উপাসনাদি যে অপরের হৃদয়ে শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধা উৎপন্ন করে, সত্য হইতে বিচ্যুতি ও প্রকৃত জীবনের অভাবই তাহার প্রধান কারণ। সুতরাং উৎসবকে সফল করিতে হইলে, এ বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। আমাদের উপাসনাকে এবং সমস্ত বাক্য চিন্তা কার্য্য ও ভাবকে সর্ব্বোপরি সত্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে।

এবারকার উৎসব যাহাতে যথার্থই সফল হয়, তাহার জন্য আমাদের সকলকে বিশেষভাবে যত্নশীল হইতে হইবে। এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে। সেদিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। আমরা সকলে একান্ত হৃদয়ে তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া উৎসবের জন্য প্রস্তুত হই। উৎসব মধ্যে সর্ব্বোপরি তাঁহার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক। আমরা এবার সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া যাই।

ভক্তির ধর্ম্ম ও ভয়ের ধর্ম্ম

(দারজিলিং ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত উপদেশ)

এ সংসারে নাস্তিক কেহই নাই। যে আপনাকে উচ্চকণ্ঠে নাস্তিক বলিয়া ঘোষণা করে, সেও অলক্ষিত ভাবে সাক্ষ্য দিয়া বসে যে, তাহার আত্মার মগ্ন-চৈতন্যের ভিতর ঈশ্বরবিশ্বাস অটল হইয়া আছে। তবে, সে জানে না, কিম্বা তাহাকে ঈশ্বরবিশ্বাস বলিয়া পরিচয় দিতে সে প্রস্তুত নয়। জিজ্ঞাসা করিলে তাহার অন্য একটা নাম সে দিবে। কিন্তু মানুষ যাহাই বলুক, তাহার মগ্ন-চৈতন্যের গভীরতার ভিতর একটা অনির্ব্বচনীয় বস্তু আছে,—সেটি তাহার বিশ্বাস। ইহাই হইল সকল ধর্ম্মের প্রাণ। ইহার উপরই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

পণ্ডিতগণ ধর্ম্মসকলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; ভক্তিমূলক ধর্ম্ম এবং ভয়মূলক ধর্ম্ম। ভক্তির ধর্ম্ম উন্নত শ্রেণীর, এবং ভয়ের ধর্ম্ম নিম্নে স্থান পাইয়াছে। ভক্তিমূলক ধর্ম্মের লক্ষণ প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্মে দেখা যায়। আর্য্য ঋষিগণ প্রাকৃতিক শক্তিসকলের অর্চ্চনা করিতেন। যদিও সে ধর্ম্ম সরলতায় এবং স্বাভাবিকতায় সরল শিশু ভাষার ন্যায়, তথাপি কি সুন্দর! সেই স্বাভাবিক সুন্দর ধর্ম্মই উপনিষদের উচ্চ অঙ্গের ব্রহ্মবাদে পরিণত হইয়াছিল। যাহার শৈশব সুন্দর, তাহার পরিণামও সুন্দর হইয়া থাকে। আর্য্যদিগের প্রকৃতিপূজা যে ধর্ম্মে পরিণত হইল, সেই ধর্ম্মের মন্ত্র হইল—

যো দেবাগ্নৌ যো হপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

আর্য্যগণ একদিন অগ্নিদেব, পবনদেব, বরুণদেব, সূর্য্যদেব প্রভৃতি নানা দেবতার উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিতেন; ক্রমে অনুভব করিলেন, জলে স্থলে, আকাশে, অন্তরীক্ষে, চন্দ্র-তপন-নক্ষত্রাদিতে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার অধিষ্ঠান নাই—সেই এক অদ্বিতীয় দেবতাই জল স্থল, অন্তরীক্ষ আকাশ, বাতাস, সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহনক্ষত্রাদিতে আবির্ভূত—সেই এক অদ্বিতীয় দেবতাকে নমস্কার করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন। এই কারণেই আর্য্যদিগের ধর্ম্ম উন্নত পর্য্যায়ভুক্ত!

ভয়ের ধর্ম্মের লক্ষণ কি? তাহারা দেবতার ভৈরব-মূর্ত্তিকেই ভয় করে। দেবতার সৌন্দর্য্য বা ভালবাসার কথা তাহাদের মনে স্থান পায় না। কেবল ভয়, কখন দেবতা কি সর্ব্বনাশ করেন, কোন্ বিপদে পাতিত করেন। কাজেই সেই হিংস্র দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য মানুষ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করে। এই প্রকার ধর্ম্মে ভয়ই কাজ করে। ইহা নিম্ন স্তরের আত্মার বিকাশ; সুতরাং ভয়মূলক ধর্ম্মকে নিম্ন আসন প্রদান করা হইয়াছে। অধিকাংশ অসভ্যজাতির ধর্ম্ম এই প্রকার ভয়মূলক ধর্ম্ম। তাহারা দুষ্ট দেবতার পূজা করে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে এই প্রকার দুই একটি দুষ্ট দেবতার পূজা প্রচলিত আছে—বোধ হয়, তাহা অনার্য্যদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত। যথা শীতলাদেবীর পূজা, অথবা ডাকাতেরা যে ভাবে কালীপূজা করে তাহা।

একদিন একজন বৃদ্ধা আমাকে গুরুগম্ভীর মুখে বলিলেন যে, "অমুকের সমস্ত গায়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ দেখা দিয়াছে"। হঠাৎ আমি বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু অবিলম্বেই বুঝিলাম যে তিনি বলিতেছেন, শীতলা মা ই তাঁর সমস্ত দেহে বসন্ত আনিয়া দিয়াছেন! তিনি ভয়ে সে বিপদের কথা মুখে আনিতে পারিতেছেন না, কি জানি, যদি বলেন, তার সারা গায়ে বসন্ত হয়েছে, বড় কঠিন অবস্থা! তা হ'লে শীতলামাই তার ঔদ্ধত্য দেখে রাগ ক'রে পাছে বা তাকে মেরেই ফেলেন। তাঁর নিগ্রহকে আশীর্ব্বাদ বল্‌লে হয়ত, খুশী হ'য়ে তাকে সারিয়েও তুল্‌তে পারেন, বলা যায় না,—মেজাজ খুশী হ'লে, এই হিংস্রস্বভাবা দেবী একটু ভালও কর্‌তে পারেন, অতএব শীতলা মাইএর পূজা দাও। আবার, যারা নরহত্যা কর্‌বে, চুরি-ডাকাতি কর্‌বে, তারাও কালীমায়ের পূজা দেয়। যেখানে ধর্ম্মের ভিতর ভয় কাজ করে, সেখানে মানুষ হিংস্র দেবতার তুষ্টির জন্য পূজা দেয়। তাহা নিম্নশ্রেণীর ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। সে ধর্ম্মের বিকাশ কখনই সুন্দর হইতে পারে না।

নিম্নশ্রেণীর লোকের ভিতর ভয় কার্য্য করে, তাহা অহরহঃ আমরা সংসারে দেখ্‌ছি! সাধারণ মানুষ উপরওয়ালার ক্রোধ এবং তাড়নাকে ভয় করে; যে ব্যক্তি নির্য্যাতন করে, তাকে সন্তুষ্ট কর্‌বার জন্য সকলেই ব্যস্ত! যদি কোন পদস্থ ব্যক্তি সাধুতা ও দয়ার জন্য বিখ্যাত হন, তবে তাঁহাকে কেহ ভয় করে না; ভাবে, তিনি স্বার্থ বোঝেন না, সুখ বোঝেন না, দুঃখে সহানুভূতি করেন, অতএব তাঁর কাছে ফাঁকি দেওয়া চলে, কারণ ক্রুদ্ধ হ'লেও সর্ব্বনাশ কর্‌তে পার্‌বেন না। কিন্তু যে প্রভু বৈরনির্য্যাতন-কারী ও কোপনস্বভাব, স্বার্থপর হীন প্রকৃতির মানুষেরা সেই প্রভুর কাজ করিতে হুঁসিয়ার, তাঁর পুবাদস্তুর সেবা করে, কোথায়ও ফাঁক নাই, বা তাচ্ছিল্য নাই—জানে, কখন কার সর্ব্বনাশ হয়। যে-সকল ব্যক্তি সাধুতা ও দয়ার মর্ম্ম বোঝে না, তাদের সেবা করে না, তাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করে না, দুর্দ্দান্ত লোকের খোসামুদি করিয়া জীবন কাটায়, তাদের কথা কি বলিব? কিন্তু হায়! এমন মানুষই সংসারে অনেক।

যেমন ধর্ম্মে, তেমনি লোকাচারে, ভয় যাদের প্রবর্ত্তক তাদের নিম্নাসন গ্রহণ করিতেই হইবে। আমরা যদি নিজ চিত্তের বিষয় ভাবিয়া দেখি, আমরা যে এক ঈশ্বরের উপাসক বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি, আমাদের ধর্ম্মভাব বিশ্লেষণ করিলে কি দেখি? আমাদের ভগবানের প্রতি প্রাণের অহেতুকী প্রেম কতটুকু? ভগবানকে যথার্থ কতটুকু ভালবাসি, কত টুকু ভয় করি? ভগবানের প্রসন্নমূর্ত্তি এবং রুদ্রমূর্ত্তি উভয়েরই অভিজ্ঞতা ভক্তের আছে। ভগবানের ইচ্ছার অনুগত হইয়া যে চলে সে প্রসাদ লাভ করে, এবং যে স্বেচ্ছাচারী সে ভগবানের রুদ্রমূর্ত্তি দেখে—তবুও এমন মানুষ আছে যে ভগবানকে ভয় করে, তাঁর অহেতুকী প্রেম হৃদয়ে স্থান দিতে পারে না। ভগবানের প্রতি প্রেম ভক্তির কথা যাঁরা বলেন,

তাঁরা এই বিশ্বে ভগবানের সৌন্দর্য্য, তাঁর করুণা, তাঁর দয়ার কথা বলিতে ভালবাসেন, সেই চিন্তা তাঁদের প্রাণকে মুগ্ধ করে। তাঁরা সেই ধ্যান প্রাণের অন্নজল বলিয়া গ্রহণ করেন! সৌন্দর্য্যবোধ হইতে উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মভাব কেমন করিয়া মানব চিত্তে প্রতিভাত হয়, তাহার দৃষ্টান্তের জন্য অন্য কোথায়ও যাইতে হইবে না—রবীন্দ্রনাথের বাণী তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তাহার অফুরন্ত আনন্দসঙ্গীতলহরী কি সমাচার আনিয়া দিতেছে? কেন এ প্রাণ মুগ্ধ করে যখনই শুনি :—

"এই তো তোমার প্রেম ও গো হৃদয়-হরণ,
এই যে পাতায় আলো নাচে সোণার বরণ!
এই যে মধুর আলস ভরে, মেঘ ভেসে যায় আকাশ' পরে,
এই যে বাতাস দেহে করে অমৃত ক্ষরণ!
প্রভাত আলোর ধারায় আমার নয়ন ভেসেছে—
এই তোমারি প্রেমের বাণী প্রাণে এসেছে!
তোমারি মুখ ওই নুয়েছে, মুখে আমার চোখ থুয়েছে,
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমারি চরণ।

প্রভাতের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দিয়ে তিনি যে ভক্তের প্রাণ হরণ করেন, সে ভক্তের জীবন ধন্য! দেবতা কি শুধু একজনের প্রাণ হরণ কর্‌বার জন্য এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের হাট বসাইয়াছেন? কিন্তু বোঝে কে? কার প্রাণ সেই দেবতা হরণ করেছেন? ভগবানের প্রেমের কথা বলিতে বলিতে যে আত্মহারা হয়, ধন্য তার মানবজীবন! যে, চিত্তে সৌন্দর্য্যানুভূতি আছে, তাহার আশা আছে যে, ধর্ম্ম তাহার চিত্তে সহজে প্রবেশ করিবে। হায়! সে পথ কি আমরা জানি?

হেমলতা সরকার।

সাধন প্রসঙ্গ

ধর্ম্মসাধন = কর্ত্তব্যপালন + ধ্যানধারণা

(৩০শে এপ্রিল, ১৯১৮, সঙ্গতসভা, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজমন্দির)

সাধারণ কর্ত্তব্যপালন এবং ধ্যানধারণা সকলের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু কাজের সংখ্যা কমানো আবশ্যক হ'তে পারে। বেশী কাজে লিপ্ত হ'লে ধ্যান ধারণার সময় হয় না। এ কাজ সে কাজ কর্‌তে যদি সমস্ত সময় যায়, ধ্যান ধারণাতে যদি সময় দিতে না পারা যায়, তা হ'লে তো ঠিক হ'ল না, কাজের ব্যবস্থার গোড়ায় গলদ আছে।

ধর্ম্মজীবনের আদর্শ কি সে বিষয়ে মন দেওয়া দরকার। কাজ তো কর্‌তেই হবে, কিন্তু "যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি", যোগযুক্ত হ'য়ে, পরমাত্মার সঙ্গে যোগ উপলব্ধি ক'রে, কাজ কর্‌তে হবে। কাজের দ্বারা তাঁর অর্চ্চনা কর্‌তে হবে; কিন্তু তাঁতে লগ্ন ও মগ্ন হ'য়ে কাজ কর্‌লে তবে তা হবে। প্রধান কর্ত্তব্য, তাঁতে ডোবা। তার আগে দশ কাজে হাত দেওয়া বড় ভুল। ব্রাহ্মসমাজে কর্ম্মবাহুল্য বহুস্থলে ধ্যান ধারণা ও যোগের স্থান অধিকার করেছে। যা প্রধান কর্ত্তব্য,—যোগযুক্ত হওয়া,—সে দিকে নাই। তাই কাজ ভাল হয় না। কর্ম্মযোগ নাই, কেবল কর্ম্মবাহুল্য, তাতে অহংকারের রাজত্ব।

পরব্রহ্মের প্রেরণার অধীন হ'য়ে কাজ কর্‌লেই ধর্ম্ম সাধন হয়, কল্যাণ হয়। সে জন্য যোগযুক্ত হ'তে হবে। ব্রাহ্মী স্থিতি লাভের জন্য, ধ্যান ধারণায় অনেক সময় দেওয়া দরকার। সে দিকে মন না দিয়ে, প্রথমেই কাজ কাজ কর্‌লে, আদর্শেই গোলমাল থাক্‌ল। "The one thing needful"—সর্ব্বাপেক্ষা বস্তু কি তা বুঝ্‌তে হবে। আগে লেখাপড়া, অর্থোপার্জ্জন, সংসারের আর সব কাজ। তার পরে যা পার, যতটুকু পার, ধর্ম্ম কর——এই তো দাঁড়িয়েছে! এ ভুল আদর্শ সমাজের দুর্গতির কারণ। প্রকৃত আদর্শ তা নয়। সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্ম, "তস্মিন্ প্রীতি" সাধন, যোগ সাধন, তার পর, তার অনুগত আর সব হবে। ব্রাহ্মপরিবারে ছেলেবেলা হ'তে শিক্ষা, কাজ কর্ম্ম, আচার ব্যবহার, সব ধর্ম্মানুগত হবে। ছেলেমেয়েরা যথাকালে ধর্ম্মে স্থিত, ব্রহ্মে যুক্ত হ'য়ে, পরে সংসারে প্রবেশ করবে। এই সত্য আদর্শ।

যদি বৃদ্ধ ব্রাহ্মগণের মধ্যে প্রাণগত ধর্ম্মভাবের অভাব দেখা যায়, ব্রাহ্মীস্থিতির অভাব দেখা যায়, যোগের প্রতি দৃষ্টি নাই, কেবল কাজের বাহুল্য দেখা যায়, তা হ'লে ছেলে মেয়েদের মধ্যে ধর্ম্মভাব ম্লান হবেই। কত লোক, কত ত্যাগ ও উৎসাহ নিয়ে ব্রাহ্মসমাজে এলেন, কিন্তু কাজ কাজ ক'রে কাজে ডুব্‌লেন, ব্রহ্মে ডোবা হ'ল না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লেন। তাতে সমাজের কিছু কাজ হয়, কিন্তু কল্যাণ হয় না। ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত এবং ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে কাজ অ-কাজ।

জীবনপথের পথিক

(১০)

এবারের (১৯০৪) উৎসবের ভাব ভক্তিলাভ। ভক্তির জন্য, তাঁহার প্রেমে জীবনটাকে দিবার জন্য, প্রাণে আকাঙ্ক্ষা চাই, নতুবা সুখ নাই, শান্তি নাই। এ সংসার মরুসম বোধ হয়, এই ভক্তি বিনা; এই সংসারই নন্দনকানন হয় ভক্তির দ্বারা। তিনি যথার্থ ভক্তিপিপাসু পরিত্রাণার্থীকে ভক্তি ও পরিত্রাণ দান করেন। তাঁহার দয়া অযাচিতভাবেই রহিয়াছে, আমরা চাহিলেই পাই।

দয়াময়! এই জীবনের সকলই তুমি জান। প্রভু, যখন প্রাণকে একটু আকুল করেছ, আকাঙ্ক্ষা দিয়েছ, তখন ধরিয়া রাখিবার বলও দাও। আমার তো নিজের কোন বল, কোন উপায় নাই, ধরিয়া রাখিবার শক্তিও তোমা হইতে চাই। এ জীবনে যেরূপ ভাবে চলিলে মঙ্গল হইবে, তুমি তাহা আমাকে বলিয়া দাও, আমি সেইরূপে চলিব। যখন যে ঘটনা ঘটিবে, যে অবস্থা আসিবে, তাহা সাক্ষাৎ তোমার ইচ্ছা, তোমার দান জানিয়া, তাহাতে সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ রাখিও। আমার পক্ষে কি দরকার হইবে তুমি জান। আমি কেন ভাবিব? যখন ভাবিব, মাগো, তুমি শান্তি দিও। অবিশ্বাস আসিতে দিও

না। অনেককাল অবিশ্বাসী জীবন কাটাইয়াছি। আর কেন? আজ থেকে এই প্রতিজ্ঞা যে, তোমাকে বিশ্বাস করিব, তুমি আমার মঙ্গল করিবেই। তোমার ইচ্ছা যাহা, এ জীবনে তাহাই পূর্ণ হোক্। আমার ইচ্ছা কখনই পূর্ণ করিও না, করিও না, করিও না,—তোমার চরণে আজ আমার এই প্রার্থনা।

(ক্রমশঃ)

মানব জীবন

(৯)

সত্য মিথ্যা বিচার

নানা বিষয়ে সত্য কি তা জান্‌তে পার্‌লে আমাদের অনেক সুবিধা ও আরাম হয় ব'লেই সত্যের মর্য্যাদা নয়। যাঁরা সত্যের সন্ধান কর্‌তে প্রাণপাত করেন, তাঁরা অনেকেই কোন লাভ বা সুখের আশা করেন না, কোন ফলভোগও করেন না, বরং অনেক সাধারণ সুখ ও আরাম ত্যাগ করেন, অনেক কষ্ট স্বীকার করেন। তবু তাতে নির্ম্মল আনন্দ পান কেন? সত্যের নিজেরই একটা মূল্য আছে, আনন্দ আছে, তার তুলনায় আর সব তুচ্ছ। সত্যে শ্রদ্ধা মানুষের স্বাভাবিক। সত্যে শ্রদ্ধাবান হওয়ায়, সত্যের অনুগত হওয়াতেই, মানুষের গৌরব ও নির্ম্মল আনন্দ।

দুজন বিজ্ঞানবিদের বিষয় চিন্তা কর। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে রোম নগরে ব্রুণো নামক এক ব্যক্তিকে পুড়িয়ে মারা হয়। রাজ আদেশে তাঁকে পোড়ান হয়। কেন তা জান? তিনি বিজ্ঞানের চর্চ্চা কর্‌তেন, গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ কর্‌তেন। অনেক দিন এই সব বিষয়ের আলোচনা ও পরীক্ষা ক'রে, তিনি বল্লেন যে, আমাদের এই পৃথিবীর মত আরও অনেক গ্রহ আছে। এই কথা প্রকাশ্য ভাবে বলাতে, রোমের ধর্ম্মযাজকগণ এবং রাজপুরুষগণ তাঁকে সে কথা অস্বীকার কর্‌তে বল্লেন। কিন্তু ব্রুণো বল্লেন—যা সত্য ব'লে বুঝেছি, তা অস্বীকার কর্‌তে পার্‌ব না। সেইজন্য তাঁর প্রাণ দণ্ড হ'ল। তবু তিনি সত্যকে অগ্রাহ্য ক'রে মিথ্যা কথা বল্লেন না। সত্যের জন্য প্রাণ দিলেন।

এই ঘটনার প্রায় ৩০ বৎসর পরে, বিখ্যাত গ্যালিলিও ঘোষণা করেন যে, পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে। এই কথার জন্য তাঁকে রোমের বিচারালয়ে ধ'রে আনা হয়। তখন লোকের বিশ্বাস ছিল, পৃথিবী স্থির থাকে, সূর্য্য ঘোরে। ধর্ম্মযাজক বিচারকগণ তাঁকে বল্লেন, তোমার মত পরিত্যাগ কর, বল পৃথিবী ঘোরে না, নতুবা তোমার প্রাণ দণ্ড হবে। অতি দুঃখের সঙ্গে, কেবল প্রাণের ভয়ে, গ্যালিলিও বল্লেন—না, পৃথিবী ঘোরে না। তার পরই তাঁর কোন বন্ধুকে তিনি চুপে চুপে বলেছিলেন যে, আমি অস্বীকার কর্‌লে কি হবে? পৃথিবী যে ঘুরছে। যাই হোক প্রাণের ভয়ে তিনি সত্য অস্বীকার করেছিলেন। গ্যালিলিও অনেক বড় পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু এখানে ব্রুণো এবং গ্যালিলিও দুজনের মধ্যে কে বেশী শ্রদ্ধার পাত্র? কে মহত্তর? নিশ্চয় ব্রুণো, যিনি সত্যের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। গ্যালিলিও নিজের সাময়িক দুর্ব্বলতার জন্য শেষে লজ্জিত হইয়াছিলেন এবং পুনরায় জোরের সহিত সে সত্য ঘোষণা ক'রে কারাগারে গিয়েছিলেন।

মানুষ কেন সত্যের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দান করে? কেন আমরা সত্যপরায়ণ লোককে এত শ্রদ্ধা করি? সে যা সত্য ব'লে জেনেছে, সত্য ব'লে বুঝেছে, সে যদি তার বিপরীত কথা বলে, তবে তাকে মিথ্যাবাদী বা মিথ্যাচারী ব'লে কেন নিন্দা করি? যে সত্যকে অগ্রাহ্য করে সে হীন হয় কেন? তার কারণ ভাল ক'রে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

যখন কোন সত্যকে সত্যরূপে আমরা অনুভব করি, তখন আমরা এমন কিছুর সংস্পর্শে আসি যা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এবং সেই সঙ্গেই এই বোধও আমাদের মনে জাগে যে সেই সত্যের সংস্পর্শে থাকাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব, শ্রেষ্ঠতা ও দেবত্ব; এবং সেই সত্য হ'তে সরে যাওয়াতে আমাদের হীনতা। আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং নিত্য সত্যকে আমরা নানা ভাবে উপলব্ধি কর্‌তে পারি, এবং এই শক্তি দিয়েই, এই উপলব্ধির মধ্যেই, সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে বুঝ্‌তে পারি।

আমাদের কথায় এবং ব্যবহারে যা সত্য ব'লে জানি, তার বিপরীত কথা বল্লে এবং বিপরীত কাজ কর্‌লে, পদে পদে নানারূপ ক্ষতি ও অসুবিধা তো হয়ই, কিন্তু সব চেয়ে বড় ক্ষতি হয় এই যে, আমরা সত্যস্বরূপ সকলের রক্ষক ও প্রতিপালক পরমেশ্বর হ'তে দূরে যাই।

যিনি সকল সত্যের মূল ও আধার, যিনি সকলের পিতা মাতা গুরু রক্ষাকর্ত্তা, আনন্দসুখদাতা, তাঁকে ভাল ক'রে জান্‌বার জন্যে, বুঝ্‌বার জন্যে, জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষেরা প্রাণপণ ক'রে সাধন করেছেন। বুদ্ধ যিশু মহম্মদ নানক চৈতন্য প্রভৃতি পরম ধার্ম্মিক সকলের নমস্য ব্যক্তিগণ সত্যস্বরূপ পরম সত্যকে যতদূর জান্‌তে পেরেছিলেন, প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়ে তা রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা করেছিলেন, তাই তাঁদের জীবন এত মহৎ, পবিত্র, আদর্শস্থানীয়।

কথায় ও ব্যবহারে সত্য জানা ও মানা, বিজ্ঞানে সত্য বিধি নিয়ম জানা ও মানা, ধর্ম্মে সত্যস্বরূপের প্রকৃতি জানা ও মানা,—এ সবই এক সত্যের নানা প্রকার প্রকাশ নানা ভাবে দেখা। যে যতদূর সত্য ব'লে বুঝেছে সে ততদূর সেই সত্যকে রক্ষা কর্‌লেই মানুষ, মহৎ, এবং সেই সত্যকে (যে কোন কারণে, ভয়ে বা সুবিধা অসুবিধার জন্য) অগ্রাহ্য কর্‌লেই হীন। কেহ না জান্‌লেও সে নিজের কাছেই নিজে হীন হয়।

সত্য নির্ণয় কর্‌তে গিয়ে সকলের ফল এক হয় না—কত ভুল হয়, পার্থক্য হয়। কিন্তু সে যা সত্য ব'লে বুঝ্‌বে, সে নিজে যদি তার অনুগত হয়, তবেই সে মানুষ। যে পরিমাণে সত্যমিথ্যা বিচার ক'রে, যা সত্য তার অনুগত হ'তে চেষ্টা করা যায়, সেই পরিমাণে বোঝা যায়, এই জগতের এবং মানুষের জীবনে বিধাতারূপে এক পরম সত্য আছেন। সব সত্যবোধে তাঁর সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয়।

কেশব স্মৃতি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এখন কেশবচন্দ্র সেনের মন্দিরে যাইতে হইবে, ইহাই স্থির করিলাম। মাষ্টার মহাশয়ের মুখ হইতে নূতন বিলাত হইতে প্রত্যাগত সেন মহাশয়ের অসাধারণ শক্তি ও গুণের কথা শুনিয়া, কেমন যেন তাঁহার প্রতি আমার চিত্তটা ঝুঁকিয়া পড়িল। রবিবারের সায়ংকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম—বিশেষ ব্যাকুল ভাবেই। অবশেষে রবিবারের সায়ংকাল উপস্থিত হইল;—আর দেখে কে—গোপনে সমাজে চলিয়া গেলাম। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে বেদীর উপর এক পুরুষ দেখিলাম। সে মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণ বিমোহিত হইয়া পড়িল। ইনিই আমাদের কেশব সেন। মন্দিরে যখন প্রবেশ করিলাম, তখন অর্গেন যন্ত্র সহকারে সঙ্গীত হইতেছিল। কি গান তাহা মনে নাই। তবে উপাসনার মধ্যে "ও দিন গেল, দয়াল বল না, মন রসনা।" এই গানটি গীত হইয়াছিল বেশ স্মরণ আছে। এই গানটি যখন গানের ঘর হইতে ধরা হইল, তখন উপাসকবৃন্দের অনেকের কণ্ঠ হইতেই ঐ গানের ধূয়া উঠিতে লাগিল। মন্দির এক মধুর কলরবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি সেই সকল ভাবপূর্ণ মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলাম। কয়েক জনের কণ্ঠনিঃসৃত গানের সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুবারি ঝরিয়া পড়িতেছে, দেখিলাম। কি মনোহর দৃশ্য! কি মনোহর দৃশ্য! তখন এই ভাবেই প্রাণটা পূর্ণ হইয়া পড়িল। আজ কেশবকে দেখিলাম, এবং তাঁহার মধুর উপাসনা শুনিলাম; মধুর সঙ্গীতও শুনিলাম। উপাসকবৃন্দের ভাবপূর্ণ মুখমণ্ডলও দর্শন করিলাম। বলিতে কি সেদিন আমার মনে এক অভিনব ভাবের সঞ্চার করিয়া দিল; আমি কেশবচন্দ্র সেনের মন্দিরে যেন এক অপার্থিব দৃশ্য দর্শন করিলাম; ধরাধামে এইরূপ দৃশ্যকেই স্বর্গের আদর্শ দৃশ্য বলা যাইতে পারে—স্বর্গ দর্শন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভগবদ্ভক্তি কি সামান্য জিনিষ?

ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমার আকর্ষণ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্রকে দেখিতে, তাঁহার মধুর উপাসনায় যোগ দিতে, এবং ত্রৈলোক্য সান্যাল মহাশয়ের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিবার জন্য, প্রাণ সর্ব্বদাই উৎসুক হইয়া উঠিত। সকল বিঘ্ন বাধা এড়াইয়া রবিবার সন্ধ্যার সময় মন্দিরে হাজির হইতাম। বাধাও ক্রমে প্রবল আকার ধারণ করিয়া আমাকে এ পথ হইতে বিচলিত করিতে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে লাগিল; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের আকর্ষণ আমাকে সকলপ্রকার বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, সত্যের দিকে, ভগবানের দিকে, অগ্রসর করিতে লাগিল। পিতা দুঃখে ও মনস্তাপে আমার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিলেন; আর মাকে বলিলেন, সকলে বলিতেছে অমন ছেলেকে বাড়ী থেকে তাড়াইয়া দাও। পিতৃদেব মাকে এ কথাও বলিয়াছিলেন, "অমন ছেলের ভাতের সঙ্গে একধারে ছুটি পাশ দিও।" মাতার কোমল প্রাণ এ সকল কথা একবারেই উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিল।

কেশবচন্দ্র সেন আমার জীবনের যেন মূল মন্ত্র হইয়া পড়িল। ধ্যানে জ্ঞানে কেশবচন্দ্রের মোহন মূর্ত্তি আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিল; তাঁহার সুললিত আরাধনা ও প্রার্থনাদির মধুময় ভাব আমার হৃদয়ের মধ্যে উদিত হইয়া, অনুপম সৌন্দর্য্য ও আনন্দের প্রবাহ প্রবাহিত করিতে লাগিল। সে সময় যাহার সঙ্গে যে বিষয়েরই প্রসঙ্গ করিতাম, আমি তাহার ভিতর দিয়া কেশবচন্দ্রের নাম এবং তাঁহার চিত্তহারী প্রভাবের বিষয় উল্লেখ না করিয়া প্রায় ছাড়িতাম না। কেশব নরলোকের অতীত পুরুষ, এই জ্ঞানই তখন হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ইংরাজিতে তখন যৎসামান্য অধিকার থাকিলেও, কেশবচন্দ্রের ভাবপ্রণোদিত উন্মাদকারিণী ইংরাজী বক্তৃতাগুলি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিতে লাগিলাম। তাঁহার "Young Bengal", "This is for you" (এই গুলি কেশবচন্দ্র যখন বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কার্য্য করিতেন, তখন লিখিয়াছিলেন,) পত্রগুলি, তাঁহার মেডিক্যাল কলেজ বেথুন সোসাইটিতে প্রদত্ত যুগান্তরকারী ও বাগ্মীতার শ্রেষ্ঠতম পরিচায়ক Jesus Christ—Europe & Asia; রেভারেণ্ড লালবিহারী দের ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে বক্তৃতার প্রতিবাদে আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত Brahmo Samaj Vindicated, ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত Destiny of Human Life, প্রভৃতি বক্তৃতাগুলি পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, কেশব সামান্য পুরুষ নহেন। তরুণ যৌবনে কেবল যে তাঁহার বক্তৃতাগুলি পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা নহে। টাউন হলে তিনি যখন বক্তৃতা প্রদান করিতেন, তখন ঐ সুপ্রশস্ত হলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়া যাইত। কেশব দাঁড়াইয়া যখন বক্তৃতা আরম্ভ করিতেন, তখন শ্রোতৃবর্গ বক্তার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত, যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া। আমিও বহুবার ঐ শ্রোতাদের সঙ্গে বসিয়া, তাঁহার "Inspiration"; "Behold the Light of Heaven in India"; "India asks who is Christ"? Philosophy & Madness in Religion, "Am I an Inspired Prophet?" প্রভৃতি বক্তৃতাগুলি শ্রবণ করিয়াছি। বক্তার গাম্ভীর্য্য, তাঁহার অনুপম মুখের সৌন্দর্য্য, এখনও স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায় নাই—যাইতে পারে না। কেশবের কণ্ঠনিঃসৃত জলস্রোতের ন্যায় বক্তৃতার মধুর ধ্বনি যেন এখনও আমার কর্ণকুহরে নিনাদিত হইতেছে। এ কি ভুলিতে পারি যে দিন তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জ্যোতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "Behold the Light of Heaven in India, how bright, how beautiful, how it ascends," ইত্যাদি? এ কি ভুলিতে পারি, যেদিন তিনি পরম বিশ্বাসী ও ভক্ত যীশুর প্রতি হৃদয়ের গভীর ভালবাসা প্রদর্শন করিয়া, বলিলেন,—"My Jesus, sweet Jesus, the necklace of my heart; twenty years have I cherished thee in my miserable breast" ইত্যাদি? এগুলি টাউন-হলে বিবৃত উক্তি। কিন্তু পাঠক পাঠিকারা স্মরণ রাখিবেন, ঐ উক্তি আমার সেই সময়কার স্মৃতি হইতে উল্লেখ করিলাম। কেশব তাঁহার Jesus

Christ—Europe and Asia নামক বক্তৃতায়, ভারতবাসীর উপর ইংরাজদিগের অনেক সময় ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের ব্যতিক্রমের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই সুবিখ্যাত বক্তৃতা প্রকাশিত হইলে, তাৎকালিক ভারতের শাসনকর্ত্তা স্যার জন লরেন্স, উহা পাঠ করিয়া, এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি কেশবচন্দ্রকে সেজন্য ডাকিয়া পাঠান। কেশব রাজভবনে উপস্থিত হইলে, লরেন্স তাঁহার বিশেষ সমাদর করিয়া, তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেকেলে লোকের মতন Divine Rights of kings মানিলেও, উক্ত বক্তৃতাটিতে আমরা কথঞ্চিৎ উচ্চ রাজনৈতিক ভাবের আভাস পাইয়া থাকি। যাহা হউক, কেশবচন্দ্র চিরদিনই বড় রাজভক্ত ছিলেন; এবং রাজা ভগবানের প্রতিনিধি, এইরূপ মতই তাঁহার ধর্ম্মমতের অন্যতম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

তাঁহার "Great Men" নামক বক্তৃতা খুব সুন্দর সন্দেহ নাই; কিন্তু এ বক্তৃতাতে তিনি যেরূপ ভাব সমর্থন করিয়াছেন, তাহা সমর্থন করা যায় না। আমি বহু বৎসর পূর্ব্বেই উহা পাঠ করিয়াছিলাম। তবে, এ বিষয়ে আমার এইটুকু বেশ স্মরণ আছে যে, তিনি মহাপুরুষদিগকে সৌর জগতের ধূমকেতুর সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, তাহারা যেমন আপন নিয়মে বিচরণ করে, মহাপুরুষেরাও সেইরূপ সমাজের সাধারণ লোক অপেক্ষা আপনাদিগের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়া থাকেন, ইত্যাদি। এক এক জন পুরুষ যে সময়ে সময়ে অসংখ্য মানবের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, ধর্ম্মের পথে ও নীতির পথে পরিচালিত করে, তাহাতে কি সংশয় আছে? কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা সৃষ্টি ছাড়া, নরলোকের অতীত কোন বিশেষ জীব নহেন। এক এক সময়ে এক এক জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়াই তাঁহারা কার্য্য করিয়া থাকেন। যেমন মূসা (Moses), সক্রেটিস্, বুদ্ধ, রামমোহন প্রভৃতি। মহাপুরুষেরা জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া কার্য্য করিলেও, মানবসুলভ দুর্ব্বলতা যে তাঁহারা একবারে পরিহার করিতে সমর্থ হন তাহা নহে। এ সকলের দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অতিরিক্ত মহাপুরুষবাদ সমর্থন করিতে গিয়া, মানব অনেক সময় অবতারবাদের পথেই নীত হয়। মহৎ লোকের গুণকীর্ত্তন এক কথা, আর মহাপুরুষবাদ বা অবতারবাদ সমর্থন অন্য কথা। শেষোক্ত বাদ স্বীকারে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির অভ্রান্ততা স্বীকার করিতে হয়। কেশব চন্দ্র সেনের শিষ্যেরা পরিশেষে ঐরূপ এক অভ্রান্ত মহাপুরুষ-বাদেরই মতের সমর্থক হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের Great Men নামক বক্তৃতার বিষয় প্রসঙ্গে এইরূপ কয়েকছত্র লিখিবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি পূর্ব্ব হইতেই ঐরূপ এক অভ্রান্ত মহাপুরুষবাদের মত পোষণ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার সমাজে উহা বলবৎ হইয়া দাঁড়ায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার আমোদচ্ছলে কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে দেশে কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছে, সেখানে অমুক ব্যক্তি অবতার সাজিবার জন্য এত ব্যস্ত হন কেন?

আমার জীবনের উপর কেশবচন্দ্রের প্রভাবের বিষয় বলিতে গিয়া এ সকল বিষয়ের আলোচনা বাড়ান আর এখানে উচিত নহে, তাই ক্ষান্ত হইলাম। কেশবের মধুর ও জীবন্ত উপাসনা আমার প্রাণকে একবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল। তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনা যেন ভগবানকে আত্মার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিত। আমিও উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলাম। মৎস্যের পক্ষে জল যেমন, জিহ্বার পক্ষে শর্করা যেরূপ, মানবাত্মার পক্ষে উপাসনা ও প্রার্থনাও সেইরূপ বুঝিতে পারিলাম। এই বাল্যজীবনে আত্মার কল্যাণপক্ষে ভগবদ্ আরাধনা ও প্রার্থনা অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়াই ধরিয়াছিলাম; উহা এখনও তেমনিই মনে করি।

আমরা পটলডাঙ্গা গোলদিঘির অতি নিকটেই বাস করিতাম; একদিন অপরাহ্নে মৃদঙ্গের ধ্বনির সহিত মানবকণ্ঠ-নিঃসৃত সংগীতধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র ছুটিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম, কেশবচন্দ্রের সংকীর্ত্তনের দল। আমার মনে হয়, ইংলণ্ড হইতে কেশবচন্দ্রের প্রত্যাগমনের পর এই তাঁহার দলস্থ লোকেরা প্রথম নগর সংকীর্ত্তন কলিকাতার রাজ-পথে বাহির করিলেন। আজ ছুটিয়া গিয়া দেখিলাম, কেশবচন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যেরা সকলেই নগ্নপদে উন্মত্তের ন্যায় কীর্ত্তন করিতে করিতে গোলদিঘি-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। তাহার মধ্যে, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রভৃতিকে দেখিয়াছিলাম। "তোরা আয়রে ভাই, নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম" এই সংকীর্ত্তনটিই তাঁহারা গাহিতেছিলেন। পরে ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে জানিয়াছি, এইটিই প্রথম নগর সংকীর্ত্তন। কেশবের দল ঐ কীর্ত্তনটি গাহিতে গাহিতে গোলদিঘি প্রবেশ করিলে, কেশবচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের বাড়ীর বহির্দেশের সিঁড়ির উচ্চস্তরে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় কিছু স্মরণ না থাকিলেও, সোণার চশমাধারী কেশবচন্দ্রের অপরূপ মুখের জ্যোতি এখনও আমার মনশ্চক্ষুর সামনে আসিয়া যেন উপস্থিত হইতেছে, আর যেন এই কথা আমাকে বলিয়া দিতেছে, ভিতরে ব্রহ্মজ্যোতির স্ফুরণ না হইলে, মানব মুখমণ্ডলে এমন জ্যোতি প্রতিভাত হয় না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, তাঁহার ব্রাহ্ম সামাজের ইতিবৃত্তে, কেশবচন্দ্রের বদনমণ্ডলের কিঞ্চিৎ উল্লেখে এই মর্ম্মের কথাই প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেশবচন্দ্রের মুখের ন্যায় এমন মুখ প্রায় দেখা যায় না। এইরূপ কথা শতকণ্ঠ হইতে বিনির্গত হইয়াছে। একবার হরিনাভী সমাজে কেশব সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিতে গমন করিয়াছিলেন। সেই স্থলের একজন ব্রাহ্মণ—বেশ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত,—আমাকে বলিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্রের মুখের মধ্যে কি যেন এক অপূর্ব্ব ভাব রয়েছে, আহা কি সৌম্য মূর্ত্তি, এমন মুখ আর দেখি নাই। ঠিক কথা, সে মুখ মানুষের তৈয়ারি নয়; স্বর্গের গঠিত। মহাপুরুষদিগের ভিতরে এক স্বর্গীয়, অপার্থিব ভাব থাকে, তাঁহাদিগের বদনমণ্ডলে সেই ভাব ফুটিয়া উঠে,

তাহাতেই তাঁহাদের দর্শনে লোকে তাঁহাদিগের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ধর্ম্মরাজ্যে ধর্ম্মাত্মা নেতাদিগের এই আকর্ষণী শক্তি প্রভাবেই লোকে তাঁহাদিগের পথ অনুসরণ করিয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে ঐশী জ্যোতিঃ দর্শনেই তাঁহাদিগকে লোকে সাধারণ মানবের অতীত বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। কেশবচন্দ্র সেন মহাপুরুষ এবং ঐশীশক্তি সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, মানব চিত্ত আকর্ষণ করিবার তাঁহার অদ্ভুত শক্তি ছিল—ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহারই প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম; ভগবদ্ উপাসনা যে মানবের শান্তি ও সুখের কারণ, এই মহা সত্য প্রতীতি করিয়া নিত্য উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ঐ মহাসত্য এখনও অক্ষুন্নভাবে ধরিয়া রহিয়াছি, কখনও বিচলিত হই নাই; হইবার কারণও নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশীভূষণ বসু।

পরলোকগতা সুখদা চৌধুরী

(শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীমতী নলিনীবালা চৌধুরী কর্ত্তৃক বিবৃত)

জন্ম—ফাল্গুন ১২৮৮ সন মৃত্যু—২৫শে কার্ত্তিক ১৩৩৮ সন

বিগত পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনীর শ্রীহট্ট অধিবেশনের মধুর স্মৃতির সহিত একটী বিষাদমাখা বিয়োগান্ত স্মৃতি চিরদিনের জন্ম বিজড়িত হইয়া রহিল। শ্রদ্ধেয়া ভগিনী সুখদা চৌধুরী, নানা বাধাবিঘ্ন ও পুত্রদের নিষেধ না মানিয়া, রুগ্নদেহে কন্যাদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া, কেবলমাত্র সম্মিলনীতে যোগদানের জন্য, প্রাণের টানে, কলিকাতা হইতে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীহট্টে আসিয়া উপস্থিত হন। অসুস্থ শরীর লইয়াও ইহার প্রত্যেক কার্য্যে অতি আগ্রহের সহিত যোগদান করেন, এবং কলিকাতা ফিরিবার পথে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পীড়িতা কন্যাকে দেখিয়া যাইবার উপলক্ষে কুমিল্লাতে নামেন। সেখানেই মাতৃসমা জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীযুক্তা কুসুমমালা দত্তের গৃহে ৪দিন মাত্র জ্বররোগে ভুগিয়া অমরধামে মহাপ্রয়াণ করেন। আজ এই শ্রাদ্ধ দিনে তাঁহার আত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার সুন্দর জীবনীর সদ্‌গুণাবলী স্মরণ করিতেছি। অন্যান্য স্থানে তাঁহার পুত্রকন্যাগণ তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, কোন্ সূত্রে আমরা এখানে এই অনুষ্ঠান করিতেছি?

আমাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত এই অনুষ্ঠানের মধ্যে এক মহামিলনের আভাসই পাই। মহাত্মা যীশু তাঁহার ধর্ম্মমণ্ডলীর ব্যক্তিদিগকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—"ইহারাই আমার পিতা মাতা।" বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যেও এই মিলনের ভাব বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। এই সম্মিলনীর সময়ও অনেক সময়ে আমাদের মনে হইয়াছে, পরমজননীর গৃহে আমরা যেন সব পুত্রকন্যা একত্র মিলিত হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহান্ আদর্শের সার্থকতা এখানে উপলব্ধি করিতেছি। এই স্থানের ক্ষুদ্র মণ্ডলীর সাধনের ফলস্বরূপ এই ভগিনীকে এক ধর্ম্মপরিবারের লোক বলিয়া—আপনার নিজের ভগিনী বলিয়াই—মনে হইতেছে। তাই প্রাণের সহজাত আকর্ষণেই এই অনুষ্ঠান এখানে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

কুমিল্লার সুপ্রসিদ্ধ বর্দ্ধন পরিবারে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা ত্রিপুরা-গৌরব স্বর্গীয় আনন্দমোহন বর্দ্ধন মহাশয় অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ, সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তখনকার দিনে কুমিল্লার সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল, তিনি ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারকগণের অগ্রগণ্য ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল। কন্যাগণকে সুশিক্ষা-দানে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বড়ই সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন ও বহু ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত কবিতাবলী তাঁহার হৃদয়ের গভীর ঈশ্বরভক্তির পরিচয় দিতেছে। তিনি কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সেবক এবং ট্রাষ্টী ছিলেন। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যাকে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দিয়াছিলেন। কন্যাগণও জীবনে এমন ধার্ম্মিক পিতার আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহাদের স্বভাব-চরিত্রে একটা বিশেষ মাধুর্য্য লক্ষ্য করিয়াছি; তাঁহারা সৎকাজে উৎসাহশীলা ও ধর্ম্মানু-রাগিণী। কন্যাগণ পিতার উপযুক্ত হইয়া পিতার মুখোজ্জ্বল করিয়া ধন্যা হইয়াছেন। আর, পিতার ন্যায় কন্যাগণও প্রায় সকলেই সঙ্গীতানুরাগিণী ও সঙ্গীতনিপুণা। তাঁহার ৭ কন্যা ও ৪ পুত্র।

সুখদা তাঁহার চতুর্থ কন্যা। ভোলাচঙ্গনিবাসী পরলোকগত শরৎচন্দ্র চৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের কিছুকাল পরে তিনি স্বামীর কর্ম্মস্থল শ্রীহট্টে আগমন করেন এবং শ্রীহট্টেই জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। শরৎচন্দ্র নিরীহ প্রকৃতির সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। সুখদা বাল্যজীবনে পিতার যে আদর্শ পাইয়াছিলেন, ক্রমে নূতন পরিবারে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তাহা প্রতিপালন করিতে কুণ্ঠিতা হন নাই। অনেক সময় নববধূকে তাঁহার নিজের আদর্শ অনুসারে চলিতে গিয়া গঞ্জনা লাভ করিতে হইয়াছে। ক্রমে তাঁহার মনের দৃঢ়তা, চরিত্রের মধুরতা ও সত্যানুরাগ জয়যুক্ত হইয়াছে। তিনি পরিবারের সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছেন। শরৎচন্দ্র চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন। ক্রমশঃ ধর্ম্মপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর প্রবল ধর্ম্মানুরাগের ফলে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় রাজচন্দ্র চৌধুরী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী চৌধুরী শ্রীহট্টে আসিলে, তাঁহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মে এবং ব্রাহ্মসমাজে তাঁহাদের যাতায়াতের সুবিধা ঘটে। সুখদা সুগায়িকা ছিলেন, ব্রহ্মসঙ্গীত বড় মধুর কণ্ঠে গান করিতে পারিতেন। অনুরুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মসমাজে কয়েকবার ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। তাহাতে শরচ্চন্দ্রের আত্মীয়গণ অনুযোগ দিতে লাগিলেন; শরচ্চন্দ্রও, স্ত্রী সমাজে গান করেন তাহা তিনি পছন্দ করেন না, এই ভাব দেখাইতে লাগিলেন। বুদ্ধিমতী সুখদা সেই অবধি বহুকাল পর্য্যন্ত আর মন্দিরে সঙ্গীত করেন

নাই; কিন্তু প্রাণ ভরিয়া কন্যাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে কৃতী করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রথমা কন্যা কমলাক্ষী ও কনিষ্ঠা কন্যা অমিয়মুকুল বিশেষভাবে সঙ্গীতে পারদর্শী হইয়াছেন। এবার শ্রীহট্ট সম্মিলনীতে মুকুলের সঙ্গীত সকলের প্রাণে আনন্দ দান করিয়াছিল। জননী কন্যার পারদর্শিতায় নিজের সাধ পূর্ণ হইতে দেখিয়া সুখী হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে যখন শরচ্চন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন স্ত্রীকে মন্দিরে ব্রহ্মসঙ্গীত করিতে অনুরোধ করিতেন, সুখদা মৃদু হাস্য সহকারে বলিতেন, "যখন আমি সঙ্গীত করিতে উৎসুক ছিলাম, তখন তুমি বাধা দিয়েছিলে; এখন তুমি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ, কিন্তু আমার শক্তি বাধা জন্মাইতেছে। ইহা প্রকৃতির প্রতিশোধ!"

প্রথমজীবনের শিক্ষাদীক্ষা পরবর্ত্তী জীবনের পাথেয়স্বরূপ হইয়া থাকে। তাঁহার বাল্যের পিতৃগৃহের শিক্ষা, বিবাহিত জীবনে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শে গৃহকর্ম্মপালনের আকাঙ্ক্ষা এবং বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা, তাঁহাকে শেষজীবনের নানাপ্রকার সংগ্রাম ও পরীক্ষার মধ্যে বহু সাহায্য করিয়াছিল। তাঁহার মনের দৃঢ়তার আভাস একটী ঘটনায় বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। একবার তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মেসোপটেমিয়াতে সরকারী কার্য্য গ্রহণ করিয়া তথায় যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল নিরীহপ্রকৃতি পিতার তাহাতে সম্পূর্ণ অমত ছিল; তাঁহার মত লইতে সুখদাকে অনেক বেগ পাইতে হয়। অবশেষে পুত্র যখন দুইটী বৎসর নির্ব্বিঘ্নে বিদেশে চাকুরীতে কাটাইয়া আসিয়া এখানে স্থায়ী কার্য্য লাভ করিলেন, তখন পিতার প্রাণ কত আনন্দে ও পত্নীর প্রতি শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল!

স্বামী-পুত্র-কন্যা লইয়া গৃহ-সংসারে কাজ করিতেছিলেন, এমন সময় স্বামী সরকারী কাজ হইতে পেন্সন্ গ্রহণ করিয়া, স্থানীয় একটী ব্যাঙ্কের সেক্রেটারীর কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনটী বৎসর মাত্র ঐ কার্য্য করিবার অবসর পান; ঐ কার্য্য করিবার সময়ই ইংরাজি ১৯২২ সালে পরলোকগমন করেন। সুখদা যখন নিশ্চিন্তমনে আশ্রয়তরুর নীচে, পুত্রকন্যাগণকে লইয়া গৃহকর্ম্ম করিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ ঝড় দেখা দিল, আশ্রয়তরুটিকে ভূপাতিত করিল। সুখদা পুত্রকন্যাগণসহ আশ্রয়হীন হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণা নারী বিচলিত হইলেন না, ভগবানকে স্মরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সোণাকে দগ্ধ করিলে যেমন তাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি রোগ, শোক, তাপ দগ্ধ করিয়া তাঁহাকে আরো নির্ভরশীলা, আরো বিশ্বাসিনী করিয়া তুলিল।

একটী সঙ্গীত ঐ সময় তাঁহার বড় প্রিয় ছিল—"দেখিতে তরঙ্গময় ভব-পারাবার, তরঙ্গ সে নয় কিছু, আত্মই সার। অসীমের ভাব যত হৃদয়ে পাইবে, তত ক্ষুদ্র তৃণটীর মত দেখিবে সংসার"—এই সঙ্গীতটী সর্ব্বদাই শুনিতে চাহিতেন! জীবনেও ধৈর্য্যের সঙ্গে দুঃখ কষ্ট ও রোগের আঘাত অম্লানবদনে বহন করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার সকল শক্তির মূলে ছিল তাঁহার অটল ভগবন্নিষ্ঠা। সঙ্গীত, উপাসনা ও সৎপ্রসঙ্গাদিতে তাঁহার কি নিষ্ঠাই না দেখিয়াছি! যখনই কোন প্রচারক বা আচার্য্য এখানে আগমন করিয়াছেন, নিজ গৃহে তাঁহার দ্বারা উপাসনা করাইয়াছেন। পরে, স্বামীর পেনসন্ লওয়ার পর, যখন সমাজমন্দিরের নিকট বাসাবাটী আসিল, এবং মন্দিরে হাঁটিয়া যাতায়াত করিবার সুযোগ ঘটিল, তখন নিয়ম মত মন্দিরের উপাসনায় উপস্থিত থাকিতেন। উৎসবাদির সময় দেখিতে পাইতাম, সকলের পূর্ব্বেই মন্দিরে গিয়া বসিয়া আছেন।

স্বামীর পরলোকগমনের পর বহু দিবস পর্য্যন্ত দেখিতাম, সঙ্গীত ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ ভিন্ন আর কিছুতেই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিত না,—এই ভাব তাঁহার শেষ পর্য্যন্ত ছিল। তাঁহার পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে কেহ এই প্রকার শোকার্ত্ত হইলে, তিনি তাঁদেরও এই মহৌষধ দিতে ভুলিতেন না। ঐসব স্থানে শোকার্ত্তদের নিকটে গিয়া, ব্রহ্মসঙ্গীত ও প্রার্থনাদি করিবার জন্য আমাদের ডাক পড়িত। সেই সূত্রে এখন পর্য্যন্ত দু'একটী পরিবারে বৎসরে অন্ততঃ একটী দিন পরলোকগত আত্মাকে স্মরণ করিয়া সঙ্গীত প্রার্থনার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

স্বামীর মৃত্যুর পর শ্রীহট্ট সহরের জেনানা শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করেন এবং দুইটী বৎসর ঐ সরকারী কার্য্যে থাকিয়া সন্তান তিনটীর শিক্ষার ভার বহন করিতে থাকেন। এমন আত্ম-নির্ভরশীলা এবং আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্না নারী অল্পই দেখিয়াছি। নানা অভাব অনাটন দুঃখ কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করিয়া গিয়াছেন, ঘুণাক্ষরেও পরমাত্মীয়ের নিকটও তাহা প্রকাশ করিতেন না। তীক্ষ্ণ আত্মসম্মানবোধ এত প্রবল না থাকিলে হয়ত ঐ সরকারী কার্য্যে চিরদিন থাকিতে পারিতেন। কিন্তু আত্মসম্মান ত্যাগ অপেক্ষা দারিদ্র্যের দুঃখকষ্ট বহন করিয়া মনুষ্যত্ব রক্ষা করা শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মনির্ভরশীলতার জন্য সম্ভবতঃ তাঁহার দেহ এত শীঘ্র ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। বিধবা হওয়ার পর অবধি সর্ব্বদা নিজের হাতে চারটি অন্ন এবং সামান্য কিছু সিদ্ধ করিয়া তাই আহার করিতেন। কত অনুরোধ অনুনয়াদি সত্ত্বেও এ নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই। কত অনুনয় করিয়া অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও কখনও কিছু খাওয়াইতে পারেন নাই। শেষ পীড়ার সময়ও যেদিন প্রবল জ্বরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেদিনও জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সকলকে বলিয়াছিলেন, "আমি ত বেশ আছি, তোমরা এত ব্যস্ত কেন?" নিজের শরীরের প্রতি উদাসীনতায়, ভুগিয়া ভুগিয়া জীবনীশক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। এই জ্বরের প্রবল আঘাত সহ্য হইল না।

শ্রীহট্টের কার্য্যের পর কলিকাতা বাণীভবনে কয়েকমাস অধ্যক্ষের কার্য্য করিয়া শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাহা ছাড়িয়া আসিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। তৎপর কিছু দিন জ্যেষ্ঠ পুত্রের কর্ম্মস্থান শিলংএ, এবং কিছুদিন কুমিল্লা পিতৃগৃহে

বাস করিয়া বর্ত্তমানে কলিকাতায় পুত্রদের সঙ্গে বাস করিতেছিলেন। এই সকল স্থানেই সুস্থাবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদিতে নিয়ম মত যোগদান করিতে ত্রুটি করিতেন না। শ্রীহট্টে এবার যখন সম্মিলনীর অধিবেশন হওয়ার কথা হয়, তখন হইতেই ইহাতে যোগদানের সংকল্প ছিল। নানা কারণে শ্রীহট্টের এই সম্মিলনী তাঁহার বড় আকর্ষণের বস্তু ছিল। প্রথমতঃ, ১২ বৎসর পূর্ব্বে যখন শ্রীহট্টে এই সম্মিলনীর অধিবেশন হয়, তখন তাঁহারা স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া কত উৎসাহের সহিত খাটিয়াছিলেন! তাঁহাদের গৃহ এই উপলক্ষে আত্মীয় ও অতিথিগণে পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহারা ভগিনী চারিজন একত্র মিলিত হইয়া কত যে আনন্দ করিয়াছিলেন, খাটিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণে ছিল। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীহট্টের বন্ধুমণ্ডলীর সঙ্গে বহুদিবস একত্র থাকাতে এখানকার সকলের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ও প্রীতির বন্ধন ছিল। তৃতীয়তঃ, হয়ত এইভাবে মিলিত হওয়ার সুযোগ আর না-ও ঘটিতে পারে। এই সব কারণে শারীরিক অবস্থা, অর্থব্যয়, পথকষ্ট কিছুর প্রতি গ্রাহ্য না করিয়াই রওয়ানা হইলেন। পথশ্রমের কষ্ট দূর করিতেই তাঁহার দুই তিন দিন সময় লাগিয়াছিল,—শরীর এতই খারাপ ছিল। আমাদের নিষেধ না মানিয়া সম্মিলনীর প্রত্যেক কার্য্যে যোগদান করেন। তখন মধ্যে দুই দিন বৃষ্টির জন্য দুর্য্যোগ ছিল; তাহাতে ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল, তাই এখানেই তাঁহার প্রথম জর হয়।

কুমিল্লাতে বড়দিদি শ্রীযুক্তা কুসুমমালা দত্তের অসুস্থা কন্যাকে দেখিয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। তাঁহার মনস্বিনী বড় দিদিমণির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল, সর্ব্বদাই বড়দিদির গুণের কথা বলিতে যেন পঞ্চমুখ হইতেন। বড়দিদির আদর্শও সুখদার জীবনে অনেক সহায়তা করিয়াছিল। আর সত্যি বড়দিদির মত এমন ধর্ম্মপ্রাণা, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্না নারী খুব কমই দেখিয়াছি। তাঁহার কথা ভাবিলে গীতার "অনুদ্বিগ্নমনা দুঃখে সুখে চ বিগতস্পৃহঃ" বাক্যটী মনে পড়ে—নানা শোক তাপের মধ্যে অচল অটল। তাই ভগিনীদিগের সুখে দুঃখে একমাত্র জুড়াইবার স্থান বড়দিদির গৃহ। এই অঞ্চলে যখনই কোন প্রচারক জ্ঞানী ধার্ম্মিক ব্যক্তি আসেন, ঐ গৃহেই তাঁহার স্থান। ১৩ বৎসর পূর্ব্বে কুমিল্লাতে যখন সম্মিলনীর অধিবেশন হয়, বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কুমুদিনী দাস মহাশয়া তাহাতে যোগদান করেন এবং অসুস্থ হইয়া বড়দিদির গৃহে কৈলাস-ভবনে আশ্রয়লাভ করেন, এবং তাঁহার নিপুণ হস্তের আন্তরিক সেবা যত্ন লইতে লইতে নশ্বরদেহ ত্যাগ করেন। এবার ১৩ বৎসর পর সেই (শ্রীহট্টের) সম্মিলনীর পর সুখদা বড়দিদির স্নেহমমতাপূর্ণ পবিত্র ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে অমরধামে চলিয়া গেলেন, এবং সেইজন্যই যেন ব্যগ্র হইয়া শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়াছিলেন। কুমিল্লাতেই বিগত বৎসর কর্ম্মনিপুণা সদাপ্রফুল্লময়ী সোণাদিদি মোক্ষদা অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছিলেন। অন্য দুইটী ভগিনী ইতিপূর্ব্বেই ঐ লোক-বাসিনী হন। সুখদাও সেই লোকে গিয়া ভগিনীদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। সুখের হাটে ভাঙ্গন ধরিল। ইহাদের কুমিল্লায় ভগিনী চতুষ্টয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া ভগবানের প্রসঙ্গ করা আমাদের নিকট বড়ই লোভনীয় ছিল। ইহাদের পবিত্র সঙ্গলাভে ঐ পবিত্র গৃহখানি যেন পবিত্র তীর্থ বলিয়া মনে হইত। দিদি সুখদাই মধ্যবিন্দু হইয়া এই ধর্ম্মপ্রাণা ভগিনীদের সঙ্গে আমাদিগকে যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, আজ কৃতজ্ঞতাভরে তাহা স্মরণ করি।

ধনীলোকের সযত্নরক্ষিত উদ্যানে সুন্দর পুষ্প লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রস্ফুটিত হইয়া সকলের প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নির্জ্জন বনপ্রান্তে লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সুন্দর ফুল ফোটে, কে তার খবর নেয়? কিন্তু সৌরভে তাহার চারিদিক মোহিত করে, সন্দেহ নাই। তেমনি এই ধর্ম্মপ্রাণ দম্পতি যুগল লোকচক্ষুর অগোচরেই সংসার অরণ্যের এক প্রান্তে ফুটিয়া উঠিয়া, তাঁহাদের সৌরভে কেবল নিকটস্থ অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবদিগকে মোহিত করিয়া, তাঁহাদের ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া গেলেন।

তাঁহাদের উভয়েরই আত্মগোপন স্বভাব ছিল। অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল ছিল না, কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শে চলিতে যত্নশীল ছিলেন।

দেবী সুখদা পরমজননীর আহ্বানে ইহকালের কাধ্য সুসম্পন্ন করিয়াই চলিয়া গেলেন। বিনয়ী, নম্র, সংস্বভাব-সম্পন্ন গুণবান্ গুণবতী পুত্রকন্যা—তিন পুত্র ও তিন কন্যা—পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী এবং তাঁহার গুণমুগ্ধ আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব রাখিয়া অনন্ত আনন্দধামে চলিয়া গেলেন। পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন তাঁহার ভগবৎ-নিষ্ঠা, চরিত্রের দৃঢ়তা, প্রবল আত্মসম্মানজ্ঞান, অসীম ধৈর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ।

পরমজননীর নিকট প্রার্থনা, তাঁহার প্রিয় কন্যার আত্মার মঙ্গল সাধন করুন এবং তাঁহার শোকার্ত্ত পুত্রকন্যা, আত্মীয় বন্ধুদিগের প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

ব্রাহ্মসমাজ

চতুরধিকশততম ভাদ্রোৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে আগামী ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইবে। ব্যাকুল-প্রাণ নরনারী সকলে উৎসবে উপস্থিত হইয়া উহাকে সফল করিয়া তুলুন, এই প্রার্থনা।

৩রা ভাদ্র (১৯শে আগষ্ট) শুক্রবার—সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় উদ্বোধন। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ।

৪ঠা ভাদ্র (২০শে আগষ্ট) শনিবার—প্রাতে ৭ ঘটিকায় উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু বি, এ। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ এম, এ। বিষয়—"একঃ পাপানি কুরুতে ফলং ভুঙ্‌ক্তে মহাজনঃ।"

৫ই ভাদ্র (২১শে আগষ্ট) রবিবার—মহিলাদের উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৮ ঘটিকায় উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় আলোচনা সভা। বিষয়—উপাসনাশীলতা বৃদ্ধির উপায়। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় এম, এ। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আলোচনা উত্থাপন করিবেন। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দত্ত ও অন্যান্য সকলে ঐ বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় উপাসনা। আচার্য্য—পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

৬ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট) সোমবার—ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৫॥ ঘটিকায় উষাকীর্ত্তন, জোড়াসাঁকো পরলোকগত রামকমল বসুর বাটী হইতে আরম্ভ ; ৭ ঘটিকায় উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় উপাসনা ; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় এম, এ।

৭ই ভাদ্র (২৩শে আগষ্ট) মঙ্গলবার—প্রাতে ৭ ঘটিকায় উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ।

৮ই ভাদ্র (২৪শে আগষ্ট) বুধবার—প্রাতে ৭ ঘটিকায় উপাসনা ; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বালকবালিকা-সম্মিলন। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় উপাসনা ; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

৯ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট) বৃহস্পতিবার—সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় কীর্ত্তন। শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্ত ও মাণিকলাল দে প্রভৃতি কীর্ত্তন পরিচালন করিবেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে :—

বিগত ২৪শে জুলাই আদি ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম আচার্য্য ও বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নানা প্রকারে দীর্ঘ কাল ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

বিগত ১লা আগষ্ট ঢাকা নগরীতে শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার রায়ের পত্নী বেলা রায় একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত ১৪ই আগষ্ট কলিকাতা নগরীতে তাহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য এবং স্বামী সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন।

জার্মানীর একটী স্বাস্থ্য নিবাসে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দৌহিত্র নিতেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী যুবা বয়সে অল্প দিনের ক্ষয় রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। মাতা মীরা দেবী এই দেশ হইতে যাইয়া মাত্র ১০ দিন পূর্ব্বে পুত্রের নিকট উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন।

বিগত ৫ই আগষ্ট শ্রীহট্ট নগরীতে তথাকার প্রবীণ কর্ম্মী গোবিন্দনারায়ণ সিংহ ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদিগের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ১২ই আগষ্ট কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত দেবেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জির দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া দীপ্তি ও পরলোকগত রামচন্দ্র চৌধুরীর চতুর্থ পুত্র শ্রীমান বিজেতার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রেমময় পিতা নব দম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

দান—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখার্জ্জি কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতা উপাসক মণ্ডলীতে ১০৲, সাধনাশ্রমে ৫৲, দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ভাণ্ডারে ৫৲, মহিলাদিগের নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারে ৫৲ মোট—২৫৲, দান করিয়াছেন। এই দান সার্থক হউক এবং নবদম্পতি কল্যাণ লাভ করুন।

ছাত্রীদের বৃত্তি—বিগত ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ বৃত্তি পাইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম :—২০৲ বৃত্তি—আভা মিত্র, অপরাজিতা রায়। ১৫৲ টাকা—নলিনী চক্রবর্ত্তী, ইলা মজুমদার, বীণা গুহ, জ্যোৎস্নাময়ী গুপ্ত মজুমদার, কল্যাণী মুখোপাধ্যায়। ১০৲ টাকা—প্রতিভা সেন, প্রতিভা দত্ত, বীণা রায়, শোভনা রায়, শান্তি ঘোষ, অসীমা মুখোপাধ্যায়, কমলরাণী ঘোষ, আভা রায়, নীহার সেন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ কর্ত্তৃক ৩১শে শ্রাবণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ

Registered No. 56

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৫ ভাগ
১২শ সংখ্যা।

১৬ই আশ্বিন, রবিবার ১৩৩৯, ১৮৫৪ শক,
ব্রাহ্মসংবৎ ১০৩
2nd October, 1932.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় বিশ্ববিধাতা, তোমার অসীম প্রেমেই তুমি এই বিশ্ব রচনা করিয়াছ, তোমার প্রেমে মণ্ডিত করিয়াই আমাদিগকে গড়িয়াছ, এবং প্রেমের উপরেই আমাদের সমস্ত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সকলের কল্যাণ একই সূত্রে গ্রথিত করিয়াছ। অথচ, আমরা অনেক সময়ই সে কথা ভুলিয়া প্রেমের পথ হইতে বিচ্যুত হই, এবং অপরের অকল্যাণসাধন-দ্বারা নিজের অধিকতর কল্যাণবর্দ্ধনে চেষ্টিত হইয়া চারিদিকে কেবল হিংসা বিদ্বেষ অপ্রেমের অগ্নি প্রজ্বলিত করি, ও তাহাতে সকলে দগ্ধ হইয়া মরি। তুমি যে আমাদের এই বিরুদ্ধ-গমন উদাসীন ভাবে দর্শন কর, তাহা ত নয়। তুমি আমাদের হৃদয়ের সমস্ত দুর্ম্মতি দূর করিয়া শুভমতি প্রদান করিবার জন্য, তোমার প্রেম ও কল্যাণের পথে আমাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য, নিয়তই অন্তরে বাহিরে নানা রূপে চেষ্টা করিতেছ। তথাপি কেন যে আমাদের সম্যক্ চৈতন্যোদয় হইতেছে না, জানি না। তুমিই জান আমাদিগকে আরও কত দুঃখ ক্লেশ দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে, কবে আমরা তোমার প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তোমার উপযুক্ত পুত্র কন্যা হইতে সমর্থ হইব। হে করুণাময় পিতা, আমাদের ক্রটি দুর্ব্বলতা তুমি ত সকলই জান। তুমি যেরূপ করিয়াই হউক, যেরূপ দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনাতে জর্জ্জরিত করিয়াই হউক, আমাদিগকে এই দুর্গতি হইতে উদ্ধার কর, তোমার বিশুদ্ধ প্রেম ও কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত কর। তোমার প্রেমের রাজ্য আমাদের প্রতি জীবনে, সমাজে, দেশে ও জগতে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক,—সমস্ত হিংসা বিদ্বেষ বিদূরিত হউক। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হউক।

চয়ন

(মার্কাস্ অরিলিয়াসের উপদেশ)

১। উপস্থিত প্রত্যেক কার্য্য সরল ভাবে, অথচ পূর্ণ গৌরব, ন্যায়পরতা, স্বাধীনতা ও কোমলতার সহিত সম্পন্ন কর। অন্য চিন্তা মনে আসিতে দিও না। যদি জীবনের প্রত্যেক কার্য্য শেষ কার্য্য বলিয়া মনে করিতে পার, যদি সতর্কতা ও সুবুদ্ধির আদেশের প্রতি অবহেলা না কর, যদি কপটতা, আত্মম্ভরিতা এবং অসন্তোষ পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

২। যাহারা নিজের অন্তরের ভাবগতি বুঝে না, তাহারাই অসুখী হয়।

৩। এই মুহূর্ত্তে মৃত্যু হইতে পারে, এই চিন্তা করিয়া আপনার প্রত্যেক চিন্তা ও কার্য্য নিয়মিত কর।

৪। জীবন মৃত্যু, গৌরব অগৌরব, সুখ দুঃখ,—এ সকল ঘটনা যেমন সাধুদের তেমনি অসাধুদের জীবনেও ঘটে। এ সকল ঘটনা মানুষকে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট করে না। এ সকল মঙ্গলও নয়, অমঙ্গলও নয়।

৫। যে ব্যক্তি আত্মস্থ দেবপ্রকৃতি দর্শন ও তৎপ্রতি অকপট ভক্তি প্রদর্শন না করিয়া, অন্যের মনে কি আছে তাহার অনুমান ও অনুসন্ধান করে, তাহার মত দুর্ভাগা আর কেহ নাই। দেবপ্রকৃতির প্রতি ভক্তির অর্থ—তাহাকে রিপুর ও মোহের স্পর্শ হইতে নির্ম্মল রাখা, এবং সকল প্রকার আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিপদের কারণ হইতে দূরে থাকা।

সম্পাদকীয়।

স্বার্থ ও পরার্থ—বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, গৃহ পরিবারে সমাজে জগতে নিয়ত স্বার্থ ও পরার্থের যে মহা সংঘর্ষ চলিয়াছে, তাহা হইতে অবশ্যম্ভাবীরূপেই সর্ব্বত্র হিংসা বিদ্বেষ অপ্রেমের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া যাইতেছে, ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, কাহারও পক্ষেই স্থায়ী কল্যাণ লাভ ঘটিতেছে না, ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখিয়াও এখন পর্য্যন্ত কিছুতেই মানুষের চৈতন্যোদয় হইতেছে না! অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ভারতে ধর্ম্মের অতি উচ্চ তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্ত ব্রহ্মময় বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, যে পুণ্যক্ষেত্রে প্রেম ও অহিংসার উন্নততম আদর্শ সাধিত ও প্রচারিত হইয়াছে, সেখানেই অসাম্য ও হিংসা বিদ্বেষ অপ্রেম সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল আকারে প্রকাশিত হইয়া মানুষকে চরম অধঃপতনের অবস্থায় উপনীত করিয়াছে, তাহাকে কিছুতেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে, প্রকৃত মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে দিতেছে না! ধর্ম্মের উক্ত মহাবাণী যে শুধু অতি প্রাচীনকালেই ভারত-আকাশে ঘোষিত হইয়া লুপ্ত ও নীরব হইয়াছিল, তাহা নহে। পরেও কত মহাজন বার বার তাহা ঘোষণা করিয়াছেন, দেশকে উদ্বুদ্ধ করিয়া প্রকৃত কল্যাণের পথে চালিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। এখনও যে কেহ কেহ তাহা না করিতেছেন, এমন নহে। তথাপি মোহান্ধ মানুষ চিরকাল মিথ্যা স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়াই নিজের প্রকৃত স্বার্থ ও কল্যাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে ও দিতেছে, এবং নিজের ও অপরের মহা অকল্যাণ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। প্রত্যেকেরই এই মোহ হইতে মুক্ত থাকা একান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে আমাদের সকলেরই গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে।

মানুষকে মহত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই বিশ্ববিধাতা তাহাকে আপনার বুদ্ধি বিচার দ্বারা প্রকৃত কল্যাণের পথ বাছিয়া লইবার অধিকার দিয়াছেন, বৃক্ষলতা পশুপক্ষীদের ন্যায় তাহাদিগকে একমাত্র তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে বাধ্য করেন নাই। মানুষ যাহাতে প্রকৃত কল্যাণ বাছিয়া লইতে পারে এবং সে পথে চলিতে পারে, তাহার জন্য তাহাকে যেরূপ তিনি যথোপযুক্ত শক্তি সামর্থ্য দিয়াছেন, তেমনি কতকগুলি বাধা বিঘ্নেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন—সে গুলি অতিক্রম করিয়াই, তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিয়াই, তাহাকে চলিতে হয়, তাহাতেই তাহার শক্তি বৃদ্ধি পায় ও প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়। যে বুদ্ধি বিচার দ্বারা প্রকৃত পথ বাছিয়া লইতে এবং সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বাধা বিঘ্নের উপর জয় লাভ করিতে ক্ষান্ত থাকে, তাহাকে দীর্ঘকাল কল্যাণ লাভে বঞ্চিত থাকিয়া অবনতির পথেই যাইতে হয়, যে পর্য্যন্ত না সে-পথের দুঃখ ক্লেশে জর্জ্জরিত হইয়া জাগিয়া উঠে, ও বিপথ হইতে ফিরিতে বাধ্য হয়। মানুষ যখন বিচার বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া চিন্তাবিহীন ভাবে পশুপক্ষীর ন্যায় শুধু প্রবৃত্তির অধীন হইয়া চলে, তখন সে যে প্রকৃত কল্যাণের পথ নির্ণয় করিতে পারে না, এবং অনেক সময় বিপথেই চালিত হয়, তাহা সহজেই সত্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সেই হেতু প্রবৃত্তিই মানুষকে বিপথে চালিত করে, এরূপ মনে করিলে মহা ভুলই করা হইবে। কেননা, প্রবৃত্তি সকল কার্য্যেরই চালক—সুপথে বিপথে উভয় পথেই প্রবৃত্তি আমাদিগকে চালিত করে, চলিবার প্রেরণা ও শক্তি প্রদান করে। কিন্তু বুদ্ধি বিচারই পথ নির্ণয় করিয়া দেয়, বিচারের অভাবেই, চিন্তাহীনতা-বশতঃই, আমরা প্রকৃত পথ ধরিতে পারি না, বিপথকেই সুপথ বলিয়া গ্রহণ করি। সে জন্য প্রবৃত্তি কোনও ক্রমে দায়ী নহে।

মানুষ সর্ব্বাগ্রে আপনার কল্যাণ ও স্বার্থ দেখিবে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—কিছুমাত্র দূষণীয় নহে। যথোচিত সীমার মধ্যে এই প্রবৃত্তি তাহার উন্নতির পথে পরম সহায়, কোনও রূপেই পরিপন্থী নহে। কিন্তু উহা যখন ন্যায়ের নির্দ্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিয়া পরার্থের অধিকার আক্রমণ করে, পরার্থকে স্বার্থের বিরোধী মনে করিয়া তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, পরার্থ বিসর্জ্জন দিয়াই স্বার্থ সাধনে তৎপর হয়, তখনই স্বার্থ অনর্থের রূপ ধরিয়া মহা অনিষ্টকারী হইয়া দাঁড়ায়, নিজের ও অপরের অকল্যাণের কারণ হইয়া সকলের সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন করে, মহাপাপে পরিণত হয়। উপযুক্ত চিন্তা ও বিচারের অভাবেই মানুষ মনে করে, অপরের প্রাপ্য অংশ হইতে যতটা সম্ভব 'বড় ভাগ' গ্রহণ করিয়া নিজের অংশটা যত বৃদ্ধি করা যায় ততই তাহার স্বার্থ সংসাধিত হয়, সে অধিকতর লাভবান হয়। সেই একই কারণে মানুষ বুঝিতে পারে না যে, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে সে নিজেও ক্ষতিগ্রস্তই হয়, নিজ স্বার্থেরও বিনাশসাধনই করে। সে যদি একটু চিন্তা ও অনুসন্ধান করিয়া দেখিত, তাহা হইলে অনায়াসেই বুঝিতে সমর্থ হইত যে, প্রেমময় বিশ্ববিধাতার বিধানে স্বার্থে ও পরার্থে কোনই বিরোধ নাই, বরং পরার্থসাধনেই স্বার্থ পূর্ণরূপে ও প্রকৃষ্ট ভাবে সংরক্ষিত হয়, এবং আনন্দ সুখও ইহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়। প্রকৃত আনন্দ সুখ ও কল্যাণ, ইহাদের যেদিক হইতেই বিচার করিয়া দেখা যাউক না কেন, সকল অবস্থায় এই সত্যই প্রমাণিত হইবে। শুধু যে সকল দেশের ও সকল কালের তত্ত্বদর্শী ঋষিগণই ইহা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, আমরাও সামান্য অনুসন্ধান করিলেই চারিদিকে ইহার অসংখ্য প্রমাণ দেখিতে পাই। সাংসারিক বিষয়েও দেখা যায় পরার্থ হরণ করিয়া কেহই এই পৃথিবীতে স্থায়ী উন্নতি ও সুখলাভ করিতে পারে নাই, বরং যে পরার্থে আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়াছে, সে-ই স্থায়ী সুখ শান্তি কল্যাণ লাভ করিয়াছে। সমস্ত জগতের মঙ্গলামঙ্গল এমন ভাবেই অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে যে কেহই অপরের অকল্যাণ সাধন করিয়া নিজের কল্যাণ কিছুমাত্র বর্দ্ধন করিতে পারে না, তাহার দ্বারা কেবল মাত্র নিজেরই অধিকতর অনিষ্ট উৎপাদন করে। অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস উজ্জ্বলরূপেই এই সত্য প্রমাণ করিতেছে, এই মহাশিক্ষা প্রদান করিতেছে।

মানুষ প্রেমে গঠিত। প্রেমই তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। প্রেমের বিকাশেই তাহার পূর্ণতম উন্নতি ও কল্যাণ। ইহলোকে ও পরলোকে এমন আর কিছুই নাই, যাহার বিনিময়ে সে এই প্রেম বিসর্জ্জন দিতে পারে—যাহা তাহার পক্ষে অধিকতর লোভনীয় ও লভনীয় হইতে পারে। অপর কিছুই ইহাকে অধিকতর স্থায়ী ও বিশুদ্ধ আনন্দ সুখও দিতে পারে না। সুতরাং এই প্রেমকে পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা করাতেই যে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থ, এবং, হিংসা বিদ্বেষ অপ্রেম ত অতি দূরের কথা, প্রেমের বিন্দু পরিমাণ খর্ব্বতাও যে তাহার প্রকৃত স্বার্থের ঘোরতর বিরোধী, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর, প্রেম যে স্বভাবতঃই পরার্থপরতা ও আত্মত্যাগ আনয়ন করে, নিজের সুখ স্বার্থের দিকে না চাহিয়া অপরের আনন্দ সুখ কল্যাণের জন্য বিশেষ ভাবে ব্যস্ত করিয়া তোলে, আপনার সুখ স্বার্থ সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াও তাহা সাধন করিতে প্ররোচিত করে, সে কথা অধিক করিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। সর্ব্বত্রই প্রেমের এই প্রকৃতি, কোথাও তাহার অন্যথা দেখা যায় না। সুতরাং স্বার্থে ও পরার্থে যে শুধু কোনও বিরোধ নাই তাহা নহে, প্রকৃত পক্ষে পরার্থের মধ্যেই মানুষের সত্যতম ও শ্রেষ্ঠতম স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে। এই জন্যই বলা হইয়াছে "প্রীতিঃ পরম সাধনং"—প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ইহা যে শুধু ব্রাহ্মধর্ম্মেরই শিক্ষা তাহা নহে,—অল্পাধিক পরিমাণে সকল ধর্ম্মেরই সার শিক্ষা এই প্রীতি বা প্রেম সাধন। এই শিক্ষা যদি কার্য্যগত জীবনে সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইত, তবে জগতের বর্ত্তমান মহা দুর্গতির অবস্থা, ভীষণ স্বার্থের সংগ্রাম, হিংসা বিদ্বেষ অপ্রেমের নির্ম্মম দ্বন্দ্ব, আর কোথাও দেখা যাইত না,—এই পৃথিবী নিশ্চয়ই প্রেম ও সাম্যের লীলা নিকেতন হইয়া স্বর্গধামে পরিণত হইত।

জগতের বা অন্য দেশের কথা এখানে আলোচনা করিবার বিশেষ কোনও প্রয়োজন নাই। যে ভারতভূমি একদিন ধর্ম্মের বলে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তাহা যে কার্য্যগত জীবনে ধর্ম্মের এই সার শিক্ষাকে পরিত্যাগ করিয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া নামিতে নামিতে অবনতির চরম সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। এখানে অল্পসংখ্যক প্রভুত্বকামী ক্ষমতাশালী লোক আপনাদের ভ্রান্ত স্বার্থ রক্ষণ ও বর্দ্ধনের জন্য পরার্থকে যেরূপ পদদলিত করিয়াছে, বহু সংখ্যকের স্বার্থকে যেরূপ অন্যায়রূপে ও নির্ম্মম ভাবে বিনষ্ট করিয়াছে, আর কুত্রাপি সেরূপ হয় নাই। এই মহাপাপের ভীষণ ফলও আর কোনও দেশকে এরূপ ভাবে ভোগ করিতে হয় নাই। এখানকার ধর্ম্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় পরার্থ ভুলিয়া ন্যায় ও প্রেমকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দেওয়াতে যে হিংসা বিদ্বেষ অপ্রেমের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহাতে এ দেশের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণই পুড়িয়া ছারখার হইয়াছে, সকলেরই মনুষ্যত্ব একপ্রকার লোপপ্রাপ্ত পাইয়াছে। তাই দীর্ঘকাল অশেষ প্রকার দুঃখ ক্লেশ লাঞ্ছনা ভোগের দ্বারাও এখন পর্য্যন্ত সেই মহাপাপের সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত সংসাধিত হয় নাই—এই অধঃপতিত জাতির যথার্থ চৈতন্যোদয় জন্মে নাই, হৃদয়ে প্রকৃত অনুতাপ জাগে নাই, অন্তরে বিবেক উদ্যত বজ্ররূপে প্রকাশ পায় নাই। আরও কতকাল যে আমাদিগকে এই পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে জানি না। আমরা এখনও অপরের অন্যায় অবিচার ক্ষুদ্র স্বার্থপরতাকেই বড় করিয়া দেখিতেছি, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছি, তাহা নিবারণের নিষ্ফল চেষ্টায় শক্তি ক্ষয় করিতেছি। আপনাদের মধ্যে যে প্রবলতর ভাবে নীচ স্বার্থপরতা কার্য্য করিতেছে, প্রকৃত স্বার্থের দিকে যে আমাদের কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই, আমাদের স্বার্থ ও পরার্থ যে এখনও এক হয় নাই, আমরা যে এখনও অপরের প্রতি সকল প্রকার অন্যায় অবিচার অত্যাচার পরিত্যাগ করিতে এবং হিংসা বিদ্বেষ অপ্রেম হইতে মুক্ত হইয়া সকলকে প্রেমের সহিত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছি না, এবং তাহার জন্য যে আমাদের সম্যক্ চেষ্টা যত্নও নাই, সে কথা আমরা মোটেই ভাবিয়া দেখি না।

ন্যায়বান প্রেমস্বরূপ বিশ্ববিধাতার রাজ্যে যে প্রত্যেককে আপনার পাপের ফলভোগ করিতেই হইবে, আমরা নিজে যাহাতে পাপমুক্ত হইতে পারি তাহা করাই যে আমাদের প্রত্যেকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, তাহা করিলে যে আমাদিগকে কোনও প্রকারেই আর সে শাস্তিভোগ করিতে হইবে না, অপরের অন্যায় অত্যাচার লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে না, সে সমস্ত যে শুধু আমাদিগকে শুদ্ধ করিবার জন্যই তাঁহার মঙ্গল ব্যবস্থাতে আমাদের নিকট আসে, তাঁহার অপার প্রেম ও করুণা যে আমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ করে না, এ কথা আমাদিগকে বিশেষ ভাবেই স্মরণে রাখিতে হইবে, কিছুতেই ভুলিলে চলিবে না। অপরের নিকট হইতে আমরা কিরূপ ব্যবহার পাইতেছি, তাহা আমাদের দেখিবার বিষয় নহে। আমরা কি করিতেছি তাহাই দেখিতে হইবে। তাহার উপরই আমাদের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। আমরা যে এখনও নিজেদের মধ্যেই অতি তুচ্ছ বিষয়েও কে কত কম ছাড়িতে পারি এবং অপরের নিকট হইতে কত বেশী আদায় করিতে পারি তাহার জন্যই ব্যস্ত আছি, তদুদ্দেশ্যেই বিবাদ করিয়া মরিতেছি, পরস্পরের বিদ্বেষাগ্নিতে ইন্ধনই যোগাইতেছি, ইহাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে, এখনও আমরা আমাদের প্রকৃত স্বার্থ কোথায় তাহা বুঝিতে পারি নাই, আমাদের স্বার্থ ও পরার্থ এক হয় নাই, আমরা অন্তর হইতে হিংসা বিদ্বেষ অপ্রেম দূর করিতে পারি নাই, প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হই নাই। আমাদিগকে অভ্রান্ত সত্যরূপে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের প্রকৃত কল্যাণ নাই, কোনও প্রকারেই এ দেশের বর্ত্তমান দুর্গতির অবসান হইবে না। আরও দীর্ঘ কাল নিশ্চয়ই আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত চলিবে। হৃদয়ে প্রেম থাকিলে সমস্তই অতি সহজে ছাড়িয়া দেওয়া যায়। সমস্ত ত্যাগ করিয়াও প্রেমকে অটুট রাখিতে হইবে। প্রেমকে বিন্দু পরিমাণেও খর্ব্ব করিয়া আর কিছু রাখিতে গেলে প্রেম অটুট থাকে না, বিনাশই প্রাপ্ত হয়। একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই প্রেম ও অমৃতত্ব লাভ করা যায়—অন্য কোনও দ্বিতীয় উপায় নাই। সুতরাং অন্য কোনও উপায়েই আমাদের ব্যক্তিগত ও

জাতীয় উন্নতিসাধনের কিছু মাত্র আশা ও সম্ভাবনা নাই—জগতেরও কল্যাণ নাই।

করুণাময় পিতা সকলের হৃদয়ে সুবুদ্ধি জাগ্রত করুন। দেশে সর্ব্বত্র প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। সকল প্রকার হিংসা বিদ্বেষ অপ্রেম, ক্ষুদ্র স্বার্থের সংগ্রাম, স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্ব, চিরকালের জন্য এই দেশ হইতে, পৃথিবী হইতে, তিরোহিত হউক। প্রেমময়ের মঙ্গল ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

জীবন পথের পথিক।

(১৩)

আজ যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল প্রায় সবই এক প্রকার শেষ করিতে পারিয়াছি। কিন্তু একটি অপরাধও করিয়া ফেলিয়াছি! ছিঃ ছিঃ, কর্ত্তব্যপালনে এ কি রকম ত্রুটি হইয়া যায়, মনে বড়ই ক্লেশ হয়। এতদিন যাহা চাহিতেছিলাম—একটা কোন কাজ—আজ তাহা পাইলাম। এজন্য মনে খুব আনন্দ হইতেছে। ঈশ্বরকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই, প্রথম যাহা সংকল্প করিয়াছি তাহা যেন পরমেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করি।

দয়াময় পিতা, তুমি সময়ে সবই দাও। মনে কত নিরাশা আসিয়া, ভগ্নোদ্যম হইতেছিলাম! তুমি আমার সাধ পূর্ণ করিলে! শরীরও আজ ৩।৪ দিন যে ভাল আছে—ইহাতেও দেখিতেছি, নিরাশ ও ম্লান হওয়া অন্যায়। তোমার ইচ্ছা থাকিলে সবই হইবে, এই আশা ও বিশ্বাস প্রাণে যেন বলবতী থাকে। এখন সকল কর্ত্তব্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারি, এবং সকল কাজে যাহাতে প্রাণটা তোমাতে মগ্ন থাকে, এবং সব তোমারই কার্য্য এই ভাব লইয়া যাহাতে প্রতিদিন কাটাইতে পারি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। অনেক সময় বৃথা গিয়াছে, আর যাইতে দিও না, এই তোমার চরণে প্রার্থনা।

মানব জীবন

(১২)

মানুষের মনে ভাবের প্রভাব

তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, দেখ্‌তে পেলে একটি ছেলে শুষ্কমুখে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছে আর বল্‌ছে,—কাল থেকে সে কিছু খেতে পায় নি। তাকে দেখে বোঝা যায় যে, সে পেটের জ্বালায় কষ্ট পাচ্ছে। তার কেও নাই। তোমার মনে কি হয়? তাকে দুটো পয়সা বা কিছু খাবার দিতে ইচ্ছা হয়। তার প্রতি দয়া হয়। তার দুঃখ দেখে, তোমার অন্তরে দয়া হ'ল।

তুমি স্কুলে গিয়ে ক্লাসে বই রেখে বাইরে গিয়েছ। ফিরে এসে দেখ্‌লে একজন ছেলে তোমার বই চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলেছে। তা দেখে তোমার মনে কি হয়? রাগ হয়। এমন অন্যায় কাজ কেন কর্‌বে? কেও কোন অন্যায় ব্যবহার কর্‌লে, ক্ষতি কর্‌লে, আমাদের রাগ হয়। রাগের বশে আমরা বহু অন্যায় কাজ ক'রে ফেলি।

একজন মাতাল পাগলের মত যা' তা' বল্‌তে বল্‌তে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখ্‌লে তার কাছ থেকে দূরে পালাতে চাও কেন? মাতালের মাতলামী দেখে ও বিশ্রী ভাষা শুনে, মনে ঘৃণা হয়, বিরক্তি হয়, তাই।

বাড়ীর সাম্নে হঠাৎ একটা পাগল কুকুর দেখ্‌লে কি কর? ভয়ে দরজা বন্ধ কর; যদি কামড়িয়ে দেয়, সেই ভয়,—পালাতে চাও।

তোমার পোষা কুকুরের অসুখ কর্‌লে কি কর? তার কাছে থাক্‌তে চাও, তাকে আদর কর কেন? তাকে ভালবাস, তাই।

ছোট ভাইটির অসুখ কর্‌লে, নিজের খেলা ধূলো ছেড়ে, তার কাছে থাক, তার সেবা কর কেন? তাকে ভালবাস, তাই।

বাড়ীতে কোন ভাল লোক, সাধু ভক্ত এলে, মনে কি ভাব হয়? শ্রদ্ধা ভক্তি। নমস্কার কর্‌তে, সম্মান কর্‌তে ইচ্ছা করে।

এইরূপ নানা ভাব আমাদের মনে জাগে, এবং প্রত্যেক ভাবের এমন শক্তি আছে যে, তা আমাদের চালায়। রাগের অধীন হ'য়ে মানুষ অন্যকে কষ্ট তো দেয়ই, নিজেকেও কষ্ট দেয়। দয়া হ'লে মানুষ নিজের কষ্ট ভুলে অন্যকে দান করে, অন্যের সেবা করে। মনে বিরক্তি বা ভয় হ'লে, মানুষ পালায়, দূরে যায়। প্রেম হ'লে কাছে থাক্‌তে চায়, যাকে ভালবাসে তার ভাল কর্‌তে চায়। শ্রদ্ধা হ'লে সম্মান দেখাতে চায়।

উন্মাদের চেষ্টার মত, এই সব ভাবও মানুষকে চালায়। মানুষ সুস্থ থাক্‌লে এই সব ভাব জাগ্‌বেই। অন্যায় কাজ দেখে যার মনে রাগ বিরক্তি বা অশ্রদ্ধা জাগে না, সে সুস্থ নয়, তার হৃদয় মন সতেজ নয়। কিন্তু একজনের অন্যায় আচরণে যদি এতই রাগি যে সেই রাগের বশে তার প্রতি অন্যায় করি, তাহ'লে সে রাগ অনর্থের কারণ।

মা বাবা ভাই বোন কিম্বা বন্ধুদের দেখে যার ভাল লাগে না, আনন্দ হয় না, তার হৃদয় সুস্থ নয়। কিন্তু যদি আমি আমার ভাই বোন বা বন্ধুর অন্যায়কে অন্যায় ব'লে না দেখি, এবং তাহ'তে বাঁচাবার চেষ্টা না করি, তাহ'লেও আমার ভালবাসা অন্ধ, বিকৃত।

এই সব ভাবই মানুষের মঙ্গলের জন্য। কিন্তু ভাবসকলকে ঠিক রাখা বড় কঠিন। গাড়ীতে তেজী ঘোড়া থাকা ভাল; কিন্তু সেই ঘোড়াকে টেনে রাখ্‌বার ও ঠিক পথে চালাবার জন্য চালক ও লাগাম না থাক্‌লে, কি রকম হয়? পদে পদে বিপদ ও দুঃখ ঘট্‌বার সম্ভাবনা।

তেমনি, রাগ ভয় দয়া প্রীতি প্রভৃতি ভাবগুলিকে ঠিক রাখ্‌বার জন্যে চাই বিবেক ও চিন্তার শক্তি সর্ব্বদা জাগ্রত রাখা; নতুবা পদে পদে বিপথে গিয়ে পড়্‌বার ভয়, ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। মা বাপও কত সময় ভালবাসার বশে ছেলে মেয়ের

ক্ষতি করেন, বিবেক ও বিচার শক্তিকে সারথী ও লাগাম রূপে রাখেন না ব'লে। এ বিষয়ে সাবধান হ'লে, বিবেক ও বিচার-শক্তিকে শাসকরূপে রাখ্‌লে, ভাবসকল বাহকের মত সুপথে নিয়ে যা'য়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

সমাজের দায়িত্ব—ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত পরিবার এবং সন্তানগণের ধর্ম্মসাধনে সহায়তা করবার জন্য সমাজ-শক্তি দায়ী কি না? এই প্রশ্ন বহুদিন পূর্ব্বে সঙ্গতে করা হয়েছিল। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এবং আচার্য্যমণ্ডলীর প্রধান কাজই—সমাজ মধ্যে ধর্ম্ম ভাব, সাধন ভজন, অনুষ্ঠান উৎসব সজীব রাখার চেষ্টা করা। এবং সে কাজ পরিবার বাদ দিয়ে হয় না। সমাজের কেন্দ্র ও পরিধি আছে। মন্দির, আশ্রম, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, আচার্য্যমণ্ডলী এই গুলি সমাজের কেন্দ্র-স্থলে অবস্থিত। বিভিন্ন পরিবারসকল এবং নানা প্রতিষ্ঠান সমাজের পরিধিস্থলে বর্ত্তমান। যোগসূত্র কোথায়? কতটা সজীব? এইটি চিন্তার বিষয়। ৫৪ বছরের বেশী হ'য়ে গেল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটি আদর্শ ধর্ম্মসমাজ হওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্গে সকলের সম্মিলিত শক্তির সমাবেশ যাতে সম্ভব হয়,—সেদিকে লক্ষ্য রেখে নিয়মাদি প্রস্তুত করা হয়েছে। কাজও অনেক রকম হচ্ছে। কিন্তু আসল বস্তুটির প্রতি তেমন দৃষ্টি নাই। জনতাবহুল এবং আড়ম্বরবহুল কয়েকটি কাজের প্রতিই দৃষ্টি আছে; এক একটি পরিবার অথবা এক একটি সভ্যের আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নাই।

সমাজের প্রায় দেড় হাজার সভ্যের কথা ছেড়ে দিয়ে, যদি কেবল কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ, অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণ, এবং আচার্য্য ও প্রচারকগণকে ধরা যায়, কেবল যাঁরা কলিকাতায় আছেন তাঁহাদেরই ধরা যায়, তা'হ'লে দেখা যাবে সে যোগসূত্র কোথায়। নাই বল্লেই হয়।

প্রশ্ন করেছিলাম, জন কয়েক লোক প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় মন্দিরে না ব'সে, এক এক দিন এক এক পরিবারে গিয়ে উপাসনা প্রসঙ্গ কীর্ত্তনাদি করলে তো ভাল হয়? সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িত উপাসনা প্রার্থনা, জীবন সংগ্রামে সহায়তা ও সমবেদনার উপর প্রতিষ্ঠিত উপদেশ ও শাসন,—এই তো আধ্যাত্মিক সেবা। কেবল মন্দির আর অফিস আর কমিটি নিয়ে থাকলে কি সে কর্ত্তব্য, সে সেবা হয়? কেন্দ্র এই জন্য যে পরিধিতে প্রাণপ্রবাহ নিয়ে যাবে। কেন্দ্রের সমস্ত শক্তি জনতায় লুপ্ত হচ্ছে, পরিধিস্থলে অবস্থিত পরিবারগুলি পর্য্যন্ত, সন্তানগণ পর্য্যন্ত পৌঁছে না, তার কি করা যায়? এর চেয়ে বড় প্রশ্ন আর নাই। এই কাজেই সমাজ বাঁচবে, রক্ষা পাবে, শক্তি জাগবে।

ভাদ্রোৎসব

মানুষের জন্মক্ষেত্র দুইটি। একবার মানুষ জীবলোকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ করে; আবার আনন্দলোকে মঙ্গলের ক্ষেত্রে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয়। স্থলে জলে ফুলে ফলে প্রত্যক্ষ এই প্রকৃতির ক্ষেত্রটীকে আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করিতেছি, সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা ইহাকে উপভোগ করিতেছি, এবং ইহাকে ভালবাসি বলিয়া, ছাড়িয়া যাইতে চাহি না বলিয়া, ধনে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য এই পৃথিবীতে প্রতিদিন মানুষকে ঘোর সংগ্রাম করিতে হয়। কিন্তু ইহাতেই মানুষের সমস্ত চেষ্টা পর্য্যবসিত হয় নাই। বহিরিন্দ্রিয় ছাড়া মানুষের একটী গভীর অন্তরিন্দ্রিয় আছে। তাই মানুষ বহির্জ্জগতে যাহা কিছু দেখিতেছে তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই, যাহা কিছু পাইতেছে তাহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। তাই মানুষ বহির্জ্জগতের শত সংগ্রামেও যথেষ্ট ক্লান্ত হয় নাই—অন্তরের সমূহ ব্যাকুলতা, প্রাণের সকল আগ্রহ, মনের অনন্ত জিজ্ঞাসার মশাল জ্বালাইয়া অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করিয়াছে—গোপনকে আবিষ্কার করিবার জন্য। পশুদের তো এ উৎপাত নাই। তাহারা কি কখনও ভাবে যে যাহা দেখিতেছি তাহার পরেও অদৃশ্য আর কিছু আছে? তাহারা কি কখন ভাবে যাহা পাইতেছি না তাহাকেও খুঁজিতে হইবে? মানুষের কানে কানে কে বলিয়া দিল যে যাহা রহিয়াছে তাহাই সম্পূর্ণ নয়, যাহা পাইয়াছ তাহাই শেষ নয়। দেখা যায় না, তবু আরও আছে; শোনা যায় না, তবু আরও আছে। সেই আরোকে, সেই অবগুণ্ঠিতকে, সেই গুহাহিতকে যদি না পাইলে তবে কিছুই পাওয়া হইল না, কিছুই দেখা হইল না, কিছুই বোঝা গেল না।

এমনি করিয়া মানুষের জীবলোক হইতে আনন্দলোকে অভিযান সুরু হয়। সে রাজ্যে জ্ঞান প্রেম ও কল্যাণ নিঃশব্দে কাজ করিয়া চলিয়াছে। মানুষ যখন এই রহস্যলোকে উত্তীর্ণ হয়, তখন সে এমন এক আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় সত্তাকে পিতা বলিয়া, এমন একটী সত্যকে পরম আশ্রয় বলিয়া বুঝিতে পারে, যাহা চিন্তা করিতে গিয়া মন ফিরিয়া আসে। মানুষের অন্তরে জ্ঞান ভক্তি ও প্রীতি রূপে যে দেবতা বিরাজ করিতেছেন, তখন সে তাঁহাকেই প্রণাম করে। 'বড় আশ্চর্য্য মানুষের এই উপলব্ধি, এই পূজা। বড় আশ্চর্য্য এই অধ্যাত্মলোকে জন্ম-গ্রহণ। বড় আশ্চর্য্য মানুষের এই দৃশ্য জগতের অন্তর্ব্বর্ত্তী অদৃশ্য নিকেতন। মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা আশ্চর্য্য নয়, মানুষের ধন মান লইয়া কাড়াকাড়ি আশ্চর্য্য নয়—কিন্তু বড় আশ্চর্য্য মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের পর্ব্বে পর্ব্বে এই অদৃশ্যকে পূজ্য বলিয়া প্রণাম, অনন্তকে আপন বলিয়া আহ্বান।' মানুষ ত্রিশ দিন হিংসা করে, যুদ্ধ করে, উঞ্ছবৃত্তি করে—কিন্তু একদিন সে সকল প্রয়োজন সকল সংগ্রামকে অবহেলায় ঝাড়িয়া ফেলিয়া শান্তিকুঞ্জে আসিয়া বসে। মানুষ ৩৬৫ দিন এই সংসারের হাটে

বিগত ৫ই ভাদ্র রেঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজে রাত্রিকালীন উপাসনান্তে শ্রীমতী মুক্তা রুদ্র কর্ত্তৃক পঠিত।

দিন খাটিয়া দিন মজুরী নয়। কিন্তু তবু সে তাহার অন্তরের অন্তরে জানে যে এই তাহার চরম দেনা পাওনা নয়। সে নিশ্চয় জানে, এই হাটের বাহিরে দূরে নিরালায় একটী শান্তিনিকেতন আছে। সেখানে বেতন নাই, হিসাব নাই, ফল প্রত্যাশা নাই। সেখানে বে-হিসাবী হইয়া আপনার যথা সর্ব্বস্ব নিঃশেষে দান করিতে পারাই পরম লাভ। সত্য সেখানে সুন্দর, শক্তি সেখানে প্রেম, প্রভু সেখানে প্রিয়। সেইখানে একবার যাইতে হইবে। সারা দিনের শেষে একবার যাইতে হইবে, সারা বৎসরের শেষে একবার যাইতে হইবে—সারা জীবনের অন্তে হইলেও তাহাকে একবার যাইতে হইবে। নতুবা সারা জীবন যে বিপুল ভার বহিয়া বেড়াইল তাহাকে নামাইবে কোথায়? তাহার বহির্জগতের স্বার্থকে তাহার অন্তর্জগতের পরমার্থের পায়ে বিসর্জ্জন দিতে হইবে—এ কথা সে জানে। তাহার ক্ষুদ্র প্রতিদিন তাহার বৃহৎ চিরদিনের পায়ে নত হইবে।

মানুষের মধ্যে এমন একটী অপরিমেয়তা আছে যাহা তাহার সীমাকে কেবলি ছাড়াইয়া যাইতেছে। সে নিজেকে যতটুকু জানে তাহার অপেক্ষা অনেক বড় সে। সে যেখানে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার অনেক উর্দ্ধে সে উঠিতে পারে. সে সারা জীবন দুই হাতে যত কিছু সংগ্রহ করে একদিন অসীম বৈরাগ্যে সে সমস্তই ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারে, সে যাহা করিয়া থাকে, তাহার অধিক করিবার শক্তি তাহারই আছে। মৃত্যুর পক্ষ-ছায়াতলে বসিয়া সে মৃত্যুকে ব্যঙ্গ করিতে পারে,—মৃত্যুর রাজ্যে বাস করিয়া সে অমৃতের অধিকারী। যে মহাপুরুষেরা মানুষের এই সত্য পরিচয়টী পাইয়াছেন, তাঁহারা মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছেন তোমরা "অমৃতস্য পুত্রাঃ"। এত বড় আবিষ্কার, এমন আশ্চর্য্য আবিষ্কার মানুষ এ পর্য্যন্ত আর একটীও করে নাই। ভারতবর্ষের পুণ্যক্ষেত্রে এরূপ কত মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইয়াছে। সকলে আমাদের একই আশার বাণী শুনাইয়াছেন।

* * * * * * *

আমাদের এই একটী সৌভাগ্য যে মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের মহোচ্চ আদর্শকে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দেশ যেমন সহজে উপলব্ধি করিয়াছিল, এমন আর কোন দেশ পারে নাই। আমাদের দেশের সাধকেরা প্রথম হইতেই ধর্ম্মকে যেমন আশ্চর্য্য উদার করিয়া দেখিয়াছিলেন, এমন আর কোন দেশ করে নাই। তাঁহাদের 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং' রূপে ব্রহ্মোপলব্ধি মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মতই দীপ্ত—দেশগত কালগত সম্প্রদায়গত সংস্কারের লেশমাত্র বাধা ইহাকে স্পর্শ করে নাই, সর্ব্বকালে সর্ব্বমানবের ইহাই মূল ধর্ম্ম। ভারতবাসী বার বার ধর্ম্মের আদর্শ হারাইয়া ফেলিয়াছে, বার বার মন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছে। বার বার বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মমতের প্রবল আঘাত খাইয়াছে—কিন্তু সত্য ধর্ম্ম তো মরে না। চন্দন তরু যেমন আহত হইয়া সুগন্ধ ছড়ায়,—ভারতবর্ষে যখনি বাহির হইতে আঘাত লাগিয়াছে, তখনি সাধকের পর সাধক আসিয়া বার বার তাহার অন্তর্নিহিত সত্যকেই প্রকাশ করিয়া ধরিয়াছেন। ইহা এত বৃহৎ, এত উচ্চ, যে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মকে ধারণ করিতে পারে। এই যুগে, এই বিজ্ঞানের যুগেও, মানুষের চিত্ত এবং জ্ঞান মুক্তির ক্ষেত্রে যতদূরই প্রসারিত হউক্ না কেন, এই ধর্ম্মের মধ্যে সে অবাধে বিচরণ করিতে পারে, কোনখানে তাহাকে খাটো হইতে হইবে না। বস্তুতঃ সত্য কখনও সত্যের বিরোধী হয় না।

সৃষ্টির আদিম উষায় ভারতের পূর্ব্বগগনে আলোক-রশ্মিপাত হইয়াছিল। তমসঃ পরস্তাৎ যে এক আদিত্য আছেন, এ তাঁরি আলোক। মুসলমান যেদিন নূতন ধর্ম্মের মশাল লইয়া প্রবেশ করিল, প্রথমটা চোখ জ্বালা করিয়া উঠিয়াছিল,—কিন্তু শেষকালে প্রমাণ হইয়া গেল যে, সকল আলোক সকল অগ্নি বিশ্বজোড়া একই উত্তাপের অংশ, সেই একই আদিত্যের জ্যোতি। আবার অনেক দিন পরে পশ্চিম যখন তাহার আকাশ-প্রদীপ তুলিয়া ধরিল, সকলে ভাবিয়াছিল এইবার এই আলোকের সাহায্যে পথ চিনিয়া চিনিয়া চলিতে হইবে। সকলে মনে করিয়াছিল, এইবার ভারতবর্ষকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, তাহার নিজের আলোক-শিখা নিভিয়া গিয়াছে, পশ্চিমের নিকট হইতে তাহাকে আলো ধার করিতে হইবে। কিন্তু আবার কে একজন আসিয়া জানাইয়া দিলেন—ভয় নাই, ভারতবর্ষ তাহার সত্য সম্বল হারায় নাই!

আশ্চর্য্যের বিষয়, এক শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষ যখন মোহ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, যখন মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের ঐক্য পৃথিবীর আর কোন খানে মানুষের মনে পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পায় নাই, সেই সময় ভারতবর্ষের এক প্রান্তে, অখ্যাত বাংলা দেশে, রামমোহন রায় সেই বাধামুক্ত ধর্ম্মের পতাকাটীকে ঈশ্বরের প্রসাদ-বায়ুর মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ধর্ম্মের সরল আদর্শ লোকাচারের কৃত্রিম শাস্ত্রের পাষাণ দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, রামমোহন সেই দুর্গের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া ভারতবর্ষের সাধনার ধনটীকে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে মেলিয়া ধরিয়াছেন। ইহাই আমাদের ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য। এ কথা সত্য নয় যে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সমাজের বিশেষ কোন অবস্থাকে সংস্কার করিবার একটী প্রয়াস মাত্র। ব্রাহ্মের ধর্ম্ম আমাদের দেশের চিরন্তন সাধনার একটি আধুনিক আত্মপ্রকাশ। এই সাধনার উৎস, এই অমৃতের প্রস্রবণ কোন্ আদিম যুগে, কোন্ দুর্গম গিরি গুহায়, কোন্ শুভপ্রভাতে প্রথম স্ফুরিত হইয়াছিল—তারপর ইহার ধারা কখনও উচ্ছ্বসিত হইয়া দুই কূল প্লাবিত করিয়াছে, আবার কখনও শুষ্ক বালিরাশির মধ্যে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতো একেবারে হারাইয়া যাইবার জিনিষ নহে। আবার ইহার স্রোত আমাদের ঘরের দুয়ার দিয়া বহিয়া যাইতেছে। এই স্রোতস্বিনীর উপকূলে—তীর্থের ঘাটে—এই সমাজের কোলে যেদিন জন্মিয়াছি, সে দিন না জানিয়াই একটী মহৎ অধিকার লাভ করিয়াছি। এই পুণ্য সলিলে অবগাহন করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। অবশ্য আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি বলিয়া, সম্প্রদায়ের বাঁধ বসাইয়া, আমরা ইহার গতিরোধ করিতে পারিব না—একদিন সমস্ত জন্মাচ্ছাদিত

অভিশপ্ত মানবসমাজের বৃহৎ প্রান্তরে ইহা ছড়াইয়া যাইবে। সেদিন সমাজের সঙ্গে সমাজ, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞান, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্ম হাত ধরাধরি করিয়া একটী পরমতীর্থে, এক সাগরসঙ্গমে পুণ্যস্নান করিবে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু কবে সেই বন্যা জাগিবে, কোন লগ্নে সেই জোয়ার আসিবে, তাহা কে বলিতে পারে? ততদিন করজোড়ে আশাপথ চাহিয়া অপেক্ষা করিব। সাধকদের জন্য অপেক্ষা করিব। তাঁহারা কে কোন্ বেশে কোন্ দ্বার দিয়া যে নিঃশব্দে প্রবেশ করিবেন, তাহা তো পূর্ব্বাহ্লে জানা যাইবে না। কিন্তু যতক্ষণ তাঁহারা না আসিতেছেন, ততক্ষণ এই স্বল্পতোয়া প্রবাহিনীই আমাদের চরম সম্পদ। উহা সকলের অগোচরে (এমন কি আমাদের নিজেদেরও অজ্ঞাতসারে) হৃদয়ের কঠিনতম স্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধীরে প্রাণকে সিক্ত করিতেছে। একদিন আমাদের পিতামহদের সমগ্র জীবনকে যাহা প্লাবিত করিয়াছিল, আজ হয়তো আমাদের জীবনে তাহা কেবল এক প্রান্তে একটী শীর্ণ বাষ্পলেখায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তবু আমাদের কি কোন ভরসা নাই? তবু আমাদের আশা ছাড়িয়া দিবার কোন কারণ ঘটিয়াছে কি? আমরা আমাদের ক্ষুদ্রতা যদিবা ছাড়িতে না পারিয়া থাকি, তবু কেবলি কি ছাড়িবার চেষ্টা করিতেছি না? আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া আছি সেখানেই কি আমাদের একমাত্র পরিচয়?—আমরা ঊর্দ্ধে যেখানে দৃষ্টি রাখিয়াছি সেখানেই কি আমাদের আসল পরিচয় নহে? আমরা যাহারা সমবেত হইয়াছি, জানি আমাদের সকলের লক্ষ্য এক এবং ধ্রুব নয়, সকলের হৃদয় গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ নয়, জানি সাংসারিক খ্যাতি প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে পোষণ করিতেছি,—সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে সকলের উচ্চে রাখিতে পারি নাই। তবু, তবু, সকল সত্ত্বেও আজ আমরা যে ডাকে মিলিত হইয়াছি সে 'শান্তম্ শিবম্'র ডাক। যে যাহাই মনে করিয়া থাকি না কেন, তিনি ডাকিতেছেন—তিনি প্রতিদিনই ডাকিতেছেন। আমাদের সহস্র কলরব ভেদ করিয়াও সেই একের আহ্বান আজ শুনিতে পাইলাম। এক মুহূর্ত্তের জন্য সকল স্বার্থ সকল বিভেদ ভুলিয়া সেই চিরমঙ্গলকেই স্বীকার করিলাম। এই একটী শুভ মুহূর্ত্ত,—ইহা যদিবা পাঁকের মধ্যেই ফুটিয়া থাকে তবু ইহার নিষ্কলঙ্ক মুখখানি স্বর্গের পানে তুলিয়াছে। আমাদের স্বার্থ জড়তার পঙ্করাশির মধ্য হইতে এই যে একটী অনাবিল মুহূর্ত্ত ফুটিয়া উঠিল, ইহাকে তো কোন কালিমা স্পর্শ করিতে পারে নাই। পূজার শ্বেতপদ্মটীর মত ইহাকে তুলিয়া আজ মহাদেবের চরণে সমর্পণ করিয়া দিলাম।

উৎসব তো আমরা সৃষ্টি করিতে পারি না, উৎসব আমরা আবিষ্কার করিতে পারি। তিনি প্রতিদিন উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন, আমরা দেখিতে পাই নাই। তিনি প্রতিদিন নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, আমাদের সময় হয় নাই, তিনি প্রতিদিনই ডাকিয়াছেন, আমরা একদিন সাড়া দিলাম। তিনি সারা বৎসর ভরিয়া কত আলো জ্বালাইয়াছেন, কত ফুল ফুটাইয়াছেন; আমরা আজ একদিন আলো জ্বালাইয়া, ফুল সাজাইয়া, তাঁহাকে আমাদের ঘরে আহ্বান করিলাম। বলিলাম—'নমস্তেহস্তু।' এই নমস্কার যেন বৃথা না হয়,—এই নমস্কার যেন মিথ্যা না হয়।

দেবতা! তুমি জান এ জীবনে নমস্কার কতবার ব্যর্থ হইয়াছে। সম্বৎসর তোমাকে নমস্কার করি নাই। ধনের পায়ে নমস্কার করিয়াছি, ক্ষমতার পায়ে নমস্কার করিয়াছি। কেবল আজ তাহাদের ফাঁকি দিয়া, আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সামান্য শ্রদ্ধা, আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনের একটী নমস্কার তোমার জন্য আনিয়াছি। এ না হোক্ প্রতিদিনের নমস্কার, না হোক্ সারা জীবনের নমস্কার—তবু এই একটী দিনের নমস্কার তুমি গ্রহণ কর। আমাদের ললাটে তোমার আশীর্ব্বাদ রাখ। আমাদের চোখে আশার আলো ঢালিয়া দাও। আমাদের এই আশার বাণী শোনাও যে এমন দিন চিরকাল থাকিবে না। আবার সুদিন আসিবে। আবার ভারতবর্ষ—হৃতগৌরব, বিগতশ্রী ভারতবর্ষ—জগৎসভায় আপন বেদীর উপর দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে—

> "শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রাঃ
> আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
> আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

একদিন ভারতবর্ষের তপোবনে, ভারতবর্ষের আকাশে ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়া সমস্ত ভারতবাসীর প্রাণের কথা উচ্চারিত হইয়াছিল। দেবতা! তুমি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত কর—এই নিরাভরণা, এই তপস্বিনী ভারতভূমি আপনার বল্কল পরিয়াই তোমার দিকে মুখ তুলিয়া মৈত্রেয়ীর মত মধুর কণ্ঠে আবার বলিবে—

> "যেনাহং নামৃতা স্যাম্
> কিমহং তেন কুর্য্যাম্?"

ধর্ম্মের আচরণ

> ধর্ম্মঃক্ষর, ধর্ম্মাৎ পরো নাস্তি,
> ধর্ম্ম সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।

ধর্ম্মের পর যে আর কিছু নাই, ভারতীয় ধর্ম্মসাধনার ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আবিষ্কার, এবং মানব সাধারণের প্রতি ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান উপদেশ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দময় পঞ্চভূতাত্মক এই বহির্জ্জগতের মূলে যে এক অনির্ব্বচনীয় পরম শাশ্বত লোক রহিয়াছে, এবং যাহা হইতে কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলা-যোগে বাহ্য প্রকৃতি উদ্ভাসিত অথবা প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, অতীতকালের সাধকগণ সেই অন্তর-রাজ্যের অন্বেষণে বহু সাধনার পর বিশ্বের মূল কারণ সেই সত্য বস্তুর সন্ধান পাইয়াছিলেন, এবং তাহাতে নিমগ্ন হইয়া শান্তি ও আনন্দ লাভ করিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের জন্য এই মূল্যবান উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন। এই সত্যবস্তুকে লাভ করিতে

গত ১৯শে জুন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে প্রাতঃকালীন উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত কর্ত্তৃক নিবেদিত।

গেলে আত্মস্থ হইতে হয়, এবং চেষ্টা ও যত্নের সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হয়। Christ তাই বলিয়াছেন,—"Knock at the door, and it shall be opened unto you."

এই knock করার অর্থ হচ্ছে ধর্ম্মের আচরণ করা। এবং ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে নানা বিঘ্ন বিপদের মধ্য দিয়া মানব অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মকৃপা লাভ করে, এবং তাঁহার কৃপাগুণে ধর্ম্মের যে প্রকৃত স্বরূপ, "সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" "সকল জীবের মধু" তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। এই ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াই সাধক বলিয়াছেন, "ধর্ম্মের পর আর কিছু নাই"—"ধর্ম্মাৎ পরো নাস্তি।"

Imitation of Christএর সাধক ঠিক এই কথাই আর এক ভাবে বলিয়াছেন, "If thou knowest the whole Bible by heart, and the sayings of all the philosophers, what would it profit thee without the love of God and without grace ?"

"সমস্ত Bible মুখস্থ রাখিলেই বা কি হইবে, এবং সমস্ত দার্শনিকদিগের বড় বড় তত্ত্বকথা জানিলেই বা কি হইবে, ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভক্তি এবং ভগবদ্ কৃপা যদি না থাকে, তাহা হইলে এ সকলের মূল্য কি ?"

উপনিষদ্‌কার তাই বলিয়াছেন "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

জগতের যে কোন বস্তুকে অর্জ্জন করিতে গেলে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হয়, বহু কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তবে সেই কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করা যায়। ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে গেলে, সেইরূপ বহু তপস্যার প্রয়োজন; সেই জন্য ঋষি বলিয়াছেন,—"তপসা ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসস্ব" "তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর।" কারণ, এই ব্রহ্মলাভের পথ "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া" শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম। এখানে একটি কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তাহা হইলে ধর্ম্ম লাভ করা জগতের নরনারীর পক্ষে একান্ত কঠিন এবং অসম্ভব বলিলেও চলে। তাহার উত্তর এই যে, জগতের কোন বস্তুই সহজসাধ্য নয়—নারীজীবনের সার্থকতা যে সন্তান লাভ করা, তাহা করিতে মাতাকে কত না কষ্ট সহ্য করিতে হয়! এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেও কি তাঁহার কাজ শেষ হইয়া যায়? সেই সন্তানকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার কত আপ্রাণ চেষ্টা! কিন্তু তাঁহার সেই হৃষ্ট পুষ্ট সন্তানটিকে লইয়া আত্মীয় স্বজন এবং বাহিরের কত লোক কত আদর করে এবং সেই শিশু সকলের কত আনন্দদায়ক হয়! ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। ধর্ম্মসমাজে এমন কতকগুলি মানুষ থাকা দরকার যাঁহারা নিভৃতে, সকলের অজ্ঞাতসারে, মাতার সন্তানলাভের ন্যায় ধর্ম্মলাভের জন্য গভীর সাধনা ও তপস্যাতে মগ্ন থাকিবেন। এবং তাঁহাদের তপস্যালব্ধ সত্যকে গ্রহণ করিয়া বাহিরের লোকেরা অথবা জনসমাজ আনন্দ লাভ করিবে এবং কৃতার্থ হইবে। এইরূপ আরোও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যেমন, রাঁধুনীকে অন্নব্যঞ্জনাদি অনেক কষ্ট ও যত্ন স্বীকার করিয়া রন্ধন করিতে হয়। এবং তাহা যখন থালায় থালায় ভরিয়া ক্ষুধাতুর জনদিগের নিকট ধরিয়া দেওয়া হয়, তাঁহারা সেই অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন, এবং পরম পরিতোষ লাভ করেন। ইহা যেমন দেহের ক্ষুধা ও তাহার নিবৃত্তির উপায়, তেমনি মানবাত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায়, বিশ্বের নিয়ন্তা যিনি, অমৃতের সাগর যিনি, তাঁহার নিকট হইতে অমৃত সঞ্চয় করিয়া অমৃতময় জীবন লাভ করা। ঋষি এই জীবন লাভ করিবারই সঙ্কেত দিয়াছেন "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" "তপস্যার দ্বারা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা কর"। এই সকল সাধকই সত্যদ্রষ্টা হন, এবং সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুতে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত, সংসার-তাপে তাপিত নরনারীর পথপ্রদর্শক ও শান্তিলাভের উপায়-নির্দ্ধারক হইয়া সমাজকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ করিয়া রাখেন। যে সমাজে যত বেশী এই রূপ মানুষ, সেই সমাজ তত সুস্থ, এবং যে সমাজে এইরূপ সাধকের যত অভাব, সেই সমাজ ঠিক ততটাই পঙ্গু ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। সেইজন্য প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজেই কতকগুলি আচার, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান থাকে, যাহার মধ্য দিয়া নরনারীর জীবনগুলি সেই সেই সমাজের আদর্শানুযায়ী ফুটিয়া উঠিতে পারে, এবং ফুটিয়াও উঠে।

পুরাকালে যে ধর্ম্ম যতীর ও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ছিল, বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজ তাহাকে গৃহীর ধর্ম্মরূপে সাধ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এবং তাহা সামাজিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এক শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া কঠিন তপস্যা করিয়া আসিতেছেন।

ব্রাহ্মসমাজের বিবাহেতে তাই যে সকল উপদেশ ও সঙ্গীত হইয়া থাকে, তাহাতে ঐ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শই নানাভাবে ব্যক্ত করা হয়। বিবাহই ত সামাজিক জীবনের মূল, এবং বিবাহিত জীবনই ত সামাজিক জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ। এই সকল সঙ্গীতের মধ্য দিয়া কি অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব, আশা ও ভরসার কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে! এক সঙ্গীতে আছে :—

"দুজনে মিলিয়া, গৃহের প্রদীপে, জ্বালাইছে যে আলোক,
তাহাতে, হে দেব, হে বিশ্বদেব, তোমারি আরতি হোক্।"

অন্য একটি সঙ্গীতে আছে—

"তোমারি আদেশ ল'য়ে, সংসারে পশিবে দোঁহে,
তোমারি আশীষ বলে এড়াইবে মায়া-মোহে;
সাধিতে তোমার কাজ, দুজনে চলিবে আজ
হৃদয়ে মিলাবে হৃদি, তোমারে হৃদয়ে রাখি।"

বর কন্যাকে এক সঙ্গীতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে—

"বাঁধা নাহি থেকো আলসে আবেশে, ঝড়ে ঝঞ্ঝায়
চ'লে যেয়ো হেসে,
তোমাদের প্রেম দিয়ো দেশে দেশে, বিশ্বের মাঝে বিস্তারি'।"

সংসারপথে নবীন যাত্রীদিগের জন্য প্রভুর চরণে প্রার্থনা করা হইতেছে—

"তব মঙ্গল তব মহত্ত্ব, তোমারি মাধুরী তোমারি সত্য,
তোমার চিত্তে রহুক নিত্য, নব নব রূপে দিবস রাত।"

অন্য স্থানে—

"যেন চিরদিন তরে, প্রেম-মধু সঞ্চারে,
প্রেমময় কৃপাসিন্ধু তোমারি কৃপা গুণে।"

মানব জীবনের এই যে প্রেমাকাঙ্ক্ষা, ইহা হচ্চে বিশ্বের একমাত্র মূলীভূত কারণ, কারণ ইহাই ব্রহ্মের প্রকৃতি—Love is the very essence of the divine nature. গৃহস্থাশ্রমেই তাহার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। বিবাহের প্রকৃত স্বরূপ একটি আত্মার সহিত অন্য একটি আত্মার সহজ, অচ্ছেদ্য এবং সম্পূর্ণ মিলন এবং সেই আত্মিক মিলনের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও প্রেমানুভূতির মধ্যে পরম প্রেমাস্পদ প্রেমপাথার অথবা প্রেমস্বরূপ যিনি তাঁহাকে জীবনে আয়ত্ত করা। সেই মহামিলনের ফলস্বরূপে সেই বৃক্ষে যখন ফল ধরিতে থাকে, এবং স্বর্গ হইতে পুষ্প বৃষ্টির ন্যায় এক একটি সন্তান আবির্ভূত হয়, তখন পিতা-মাতার মনে যে অপার্থিব আনন্দ উদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে পরমেশ্বরের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব অনুভব করা কত সহজ! তাই কত জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন, "Human parenthood is the symbol of the relation of God to man"। তারপরে শিশুদিগের কথা, তাহারা আমাদিগকে স্বর্গরাজ্যের সংবাদ যেমন সহজভাবে দিতে পারে, এমন জগতে আর কোন কিছু পারে না। তাই ত এদেশের কবি বলিয়াছিলেন, যে গৃহ শিশুদিগের কলরোলে নিনাদিত না হয়, তাহা শ্মশান সমান। এই শিশুদিগের জীবন স্বর্গীয় জীবনের symbol। শিশুর স্বচ্ছ আনন্দ, পিতামাতার উপর অগাধ ও সহজ বিশ্বাস, অল্পেতে সন্তোষ, স্বভাবের মিষ্টতা ও পবিত্রতা, তাহার স্বচ্ছন্দ আহার ও বিহার এবং মাতৃক্রোড়ে গভীর আত্মসমর্পণ, মাতার বক্ষ-পীযুষ পান ও চিন্তাহীন সহজ নিদ্রা, এ সকল কোন্ সাধকের কাম্য ও প্রার্থনীয় নয়?

তারপর আত্মীয়-স্বজন, পরিচারক-পরিচারিকা, বন্ধু বান্ধব, দেশ বিদেশ, সসাগরা পৃথিবী. এ সকলের মধ্য দিয়া যেন বিশ্বেশ্বরের প্রেম-মন্দাকিনী অজস্রধারে প্রবাহিত হইতেছে। সাধক তাই বলিয়াছেন—"তেরো জগমন্দির উজার এ"। এই যে অপূর্ব্ব মানব জীবন, গৃহস্থাশ্রমের মধ্য দিয়া যাহার অভিব্যক্তি অতিশয় সহজ ও মহৎ, এই গৃহী জীবনের মূলে যদি ঐ প্রেমবস্তু না থাকে, এবং গৃহী যদি সেই প্রেমধনে ধনী না হন, তাহা হইলে সব অন্ধকার।

কোনও ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন—

"The night has a thousand eyes,
The day but one;
Yet the light of the whole world dies
With the dying sun.
The mind has a thousand eyes,
The heart but one,
Yet the light of the whole life dies
When love is done."

"রাত্রির হাজার হাজার চক্ষু আছে—কবি গ্রহ নক্ষত্রাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছেন। দিবসের কিন্তু একটি মাত্র আঁখি অর্থাৎ সূর্য্য। এবং এই একমাত্র চক্ষুরূপী যে সূর্য্য তাহা অস্তমিত হইলে, সমস্ত জগৎই অন্ধকারে আবৃত হইয়া যায়। ঠিক তেমনি মানব-মনের হাজার হাজার চক্ষু আছে, যাহা দিয়ে সে বস্তু-বিচার করিয়া থাকে; মানব হৃদয়ে কিন্তু একটিমাত্র আঁখি বর্ত্তমান। এবং মানব-জীবন একেবারে মরিয়া যায় তখনই, যখন তাহার সেই একটিমাত্র আঁখি অর্থাৎ প্রেম তাহার জীবন হ'তে অন্তর্হিত হয়।"

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই প্রেমধন কিরূপে এমন ভাবে লাভ করা যায়, যে তাহা হইতে আর বিচ্যুতি ঘটিবে না। মানব-হৃদয়ে কিরূপে সেই ভাস্করকে চির জ্যোতিষ্মান্ করিয়া রাখা যায়? এইখানেই সমস্যা, এবং এই সমস্যার সমাধানের অভাবেই কি ব্যক্তিগত মানব জীবন, কি সমষ্টিগত সামাজিক জীবন, জড় ব্যাধিগ্রস্ত এবং মৃতপ্রায় হইয়া উঠে—মৃতদেহ যেমন ভারবহ হয়, মানব সমাজে সেইরূপ মৃত আচার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলি মানব সমাজের গুরুভারে পরিণত হয়।

এই প্রেমধনকে লাভ করিতে গেলে, ঐ magnetic needle যেমন যে দিকেই তাকে ফিরাও না কেন, তাহা উত্তরাভিমুখীন্ হইয়া থাকিবে এবং সেই দিকে যতক্ষণ না যাইবে তাহার আর স্বস্তি নাই, সেইরূপ আমাদিগের হৃদয়কে সেই অবিনশ্বর অক্ষয় পরম জ্যোতির্ম্ময় প্রেমসূর্য্যের দিকে সর্ব্বদাই স্থির-দৃষ্টি হইয়া থাকিতে হইবে, এবং তাঁহার নিকট হইতে ঐ প্রেমালোক লাভ করিতে হইবে। তাই না সাধক গাহিয়াছেন, "সেই রসে না রসিক হ'লে মানব-জীবন ফাঁক্‌রে।" সেই মানব জীবনের এক কণা কড়িরও মূল্য নাই, যাহা এই প্রেমধনে ধনী নয়। এবং সংসারের নানা ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঘাত-প্রতিঘাত, বাদ-বিসম্বাদ, বিরোধ-বিদ্বেষ, উত্থান পতন, হাসি কান্না, সম্পদ বিপদ, জন্ম-মৃত্যু, প্রভৃতি আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক নানারূপ সুখ ও দুঃখের মধ্য দিয়া, সেই অচঞ্চল, ধ্রুব, শাশ্বত পুরুষের প্রেমময় সত্তার সহিত নিরবচ্ছিন্ন মিলনে মিলিত হইয়া, বিচক্ষণ নাবিকের ন্যায় স্বকীয় ও পরকীয় জীবন-তরণীকে ওপারের খেয়াঘাটে নিরাপদে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারে, এমন জীবনই ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ, আমাদের কাম্য এবং প্রার্থনীয়।

এই খানেই ধর্ম্মাচরণ এবং সাধনার আবশ্যকতা। তাই উপদেশ হইয়াছে, ধর্ম্মকর, ধর্ম্মের আচরণ কর, তপস্যার দ্বারা সেই অমৃত ধনকে লাভ করিয়া অক্ষয় আনন্দধামের নাগরিক হও। সেখানে "সদাব্রত তৃপ্তি অন্ন, লালসা থাকে না অন্য, সেখানে কামনা পূর্ণ, চিদানন্দ উদ্দীপন।" "যল্লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।" সেই প্রেমধনে ধনী হ'লে "তস্য তুষ্টমিদং সকলং।"

এই প্রেমধনকে লাভ করিবার গভীরতম সঙ্কেত সমগ্র হৃদয় তাহাতে অর্পণ করা। তিনি যেন বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" "কেবলমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও।"

খৃষ্টীয় মহা সাধক Brother Lawrence বলিয়াছেন, "The heart must be empty of all other things; because God will possess the heart alone; and as He cannot possess it alone without emptying it of all besides; so neither can He act there and do in it what He pleases, unless it be left vacant to Him. "অর্থাৎ আমাদের হৃদয়কে অন্য সর্ব্বপ্রকার কামনা ও বাসনা বিবর্জ্জিত করিয়া তাঁহার চরণে আহুতি দিতে হইবে। ইহা সহজসাধ্য নয়, কিন্তু ইহাই হ'চ্ছে মানবজীবনের mission, ইহা ছাড়া আর অন্য পথও নাই।

এইভাবে সেই অক্ষয় পুরুষের সহিত গভীর যোগ স্থাপিত হইলে, প্রকৃত আত্মসাক্ষাৎকার হয় এবং ভূতে ভূতে সেই আত্মদর্শন সম্ভব হয়। তাই উপনিষদ্‌কার বলিয়াছেন— "ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ" এবং এই অবস্থা লাভের পর অর্থাৎ মানবজীবনের এই mission realised হবার পর, মৃত্যু হইলে সেই সকল আত্মা—

"প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাঃ ভবন্তি।

এই লোক হইতে উপরত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।

সাধক রামমোহনও ব্রাহ্মদিগের নিকট তাঁহার এই messageই রাখিয়া গিয়াছেন; ইহা আমাদিগকে সাধন করিতেই হইবে। তিনি বলিয়াছেন "তোমাতে যে আত্মরূপে প্রকাশ সেই ব্যাপ্ত বিশ্বচরাচরে"। তিনি যদি ঋষিদিগের দ্বারা প্রচারিত এই সত্য নিজ জীবনে সাধনার দ্বারা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ না করিতেন, তাহা হইলে এত বড় কথা বলিয়া যাইতেন না।

মহাপুরুষদিগের এক একটি বাণী গভীর আত্মানুভূতিলব্ধ এবং আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ, তাই তাহা মানব জাতির উত্থান পতনের মধ্য দিয়া আবহমানকাল মানব অন্তরে এমন গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া দিতে পারে।

মানব সাধারণের পক্ষে যাহা একরকম অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, পুরুষসিংহ যাঁহারা, ধর্ম্মবীর যাঁহারা, তাঁহারা অমানুষিক অধ্যবসায় ও সাধন বলে তাহা সহজেই লাভ করিয়া থাকেন। মার্কিন ঋষি Emerson বলিয়াছেন—

"As there is no screen or ceiling between our heads and the infinite heaven, so is there no bar or wall in the soul where man, the effect, ceases, and God, the cause, begins."

"যেমন আমাদিগের মাথার উপর এবং বিশ্বাকাশের মধ্যে আর কোন পর্দ্দা বা ছাদ নাই, তেমনি মানবাত্মার এবং ব্রহ্মের মধ্যে এমন কোন বিচ্ছেদ বা বাধা নাই, যেখানে মানুষ অথবা কার্য্য শেষ হইয়াছে, এবং ব্রহ্ম অথবা কারণ আরম্ভ হইয়াছে।" মানুষের সহিত পরমাত্মার এমন গুরুতর ও গভীরতম সম্বন্ধ, অথচ আমরা এত অজ্ঞ ও মূঢ় যে সেই সৎবস্তুকে ছাড়িয়া নানা অবস্তর পিছনে ধাবমান হই! এবং তাহার ফলে বিধাতৃরচিত এই সুন্দর পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের অযোগ্য করিয়া তুলি! ধর্ম্মের নামে, ন্যায়ের নামে, জাতীয়তার নামে, মানুষ ধরাতলকে যে ভাবে পীড়িত ক'রেছে এবং আজও করিতেছে তাহার ইতিহাস অতিশয় ভয়ঙ্কর। ইহার ফলে আজ পৃথিবীব্যাপী মহা বিপ্লব দেখা দিয়াছে। এই বিপ্লবের হাতে পড়িয়া প্রচীন দেশাচার, লোকাচার ও সংস্কার সব তাসের ঘরের মত ধসিয়া পড়িতেছে। এই সকল আবর্জ্জনা ও কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আজ ধর্ম্মকেও সমাজ হইতে দূরীভূত করিতে চাহিতেছে। ধর্ম্মের নামে যে সকল অধর্ম্ম এতদিন মানব সমাজ মুখ বুজিয়া সহিয়া আসিয়াছে, তাহার মূলোচ্ছেদ আজ হইবেই, কারণ the day of reckoning has come—হিসাব নিকাশের দিন আসিয়াছে। ইহাকে ঠেকাইয়া যে রাখিতে চেষ্টা করিবে, তাহাকেই ভাসিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু সত্য যাহা, শাশ্বত যাহা, তাহা বিশ্বজনীন এবং সার্ব্বভৌমিক এবং তাহাই ধর্ম্ম। দৈহিক জগতে মানুষ যেমন বায়ু ও জল ছাড়িয়া বেশীক্ষণ বাঁচিতে পারে না, আধ্যাত্মিক জগতে সেইরূপ পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার গভীর যোগ না হইলে মানুষ কখনও সুখী ও শান্তি লাভ করিতে পারে না এবং পারিবেও না। মানব সমাজ যাহাতে এই ভুল না করে, তাহার জন্য ব্রাহ্মসমাজকে আজ সচেতন হইতে হইবে, এবং ইহার আচার, নিয়ম ও সাধন-প্রণালীকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যাহাতে ক'রে এই সমাজে মানব সন্তানগণ শিশুকাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনের সাধন দ্বারা সেই পরমবস্তু লাভ ক'রে যথার্থ ধার্ম্মিক হইতে পারেন, এবং ব্রাহ্মসমাজকে যথার্থ ধর্ম্ম সমাজে পরিণত করিতে পারেন।

জগতে আজ বড় বড় জাতি পাঁচ সালা বন্দোবস্ত অথবা তিন সালা বন্দোবস্ত করিয়া আপনাদের দেশকে শক্তিশালী ও ধন সম্পদে সম্পন্ন করিয়া তুলিবার জন্য মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সময় আমরাও ব্রাহ্মসমাজকে কিরূপে শক্তিশালী করা যায়, তাহার একটা মীমাংসায় উপনীত হ'য়ে সেই ভাবে কয়েক বৎসর কাজ করিবার পরে, সেই কয় বৎসরের experienceএর সাহায্য লইয়া, আবার পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত আকারে অভিনব সমাজ ও ধর্ম্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া, সেই আদর্শকে পুনরায় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া লাগিয়া গেলে, জগতে ব্রাহ্মসমাজের যাহা কর্ত্তব্য কার্য্য আছে তাহা সহজে সম্পাদিত হইতে পারে। বসিয়া থাকিবার কাল চলিয়া গিয়াছে, হয় আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, নয় পিছু হটিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইতে হইবে। কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, আজ যদি ব্রাহ্মসমাজ শক্তিশালী হইয়া জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, তবে জগৎ পথ দেখিবে, আর আজ যদি ব্রাহ্মসমাজ পিছু হটিতে থাকেন, তবে জগতের মহা অকল্যাণ হইবে। এই মহা যুগসন্ধিক্ষণে ভগবান তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত এই সমাজকে মহাবলশালী করিয়া তুলুন, এই প্রার্থনা।

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে :—

বিগত ১৬ই আগষ্ট মেদিনীপুর নগরীতে তথাকার ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও আচার্য্য বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রায় দুই বৎসর কাল রোগে কাতর থাকিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার চরম পত্রে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্য ৫০০৲ ও বালিকা স্কুলের জন্য ৫০০৲ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

বিগত ১৭ই সেপ্টেম্বর গিরিডি নগরীতে ডাক্তার বিপিনচন্দ্র রায় (Dr. V. Rai) দীর্ঘকাল রোগযাতনা ভোগ করিয়া ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও বিশ্বাসভক্তিতে উন্নত জীবনের জন্য সকলের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং নানা প্রকারে দীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাবে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

বিগত ২৮শে অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে মিঃ ব্রজেন্দ্র নাথ দে (Mr. B. De, I.C.S.) পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ২৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্ত প্রভৃতির মাতার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য এবং অমৃতবাবু ও কনিষ্ঠ পুত্র সুশীলকুমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ও প্রার্থনা করেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদিগের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

জাতকর্ম্ম—বিগত ২১শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষের পুত্রের জাতকর্ম (জন্ম ১৭ই আগষ্ট) অনুষ্ঠান শিশুর মাতামহ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসুর গৃহে সম্পন্ন হইয়াছে। মঙ্গলময় পিতা শিশুকে সতত রক্ষা করুন।

দান—শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ পতি পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মা চির শান্তিলাভ করুন।

রাজর্ষি রামমোহন স্মৃতি—রাজর্ষি রামমোহন রায়ের পরলোক গমনের নবনবতিতম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয়। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে এলবার্ট হলে স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য সভাপতির কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডাক্তার কালীদাস নাগ ও শ্রীমতী লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে প্রার্থনা করেন। ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজে ও রামমোহন লাইব্রেরী গৃহেও অপর দুইটি সভা হইয়াছিল।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী স্মৃতি—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনের ত্রয়োদশ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে উক্ত স্থানেই স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য ও পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়, ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল বক্তৃতা করেন। সায়ংকালে ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজেও শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের সভাপতিত্বে স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী— মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় আগামী ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে আশ্বিন (৪ঠা ৫ই ও ৬ই অক্টোবর), মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর দ্বিচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, **কুমিল্লাতে** সম্পন্ন হইবে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাদিগের এবং ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিকারীদিগের মিলনের ও ব্রহ্মোৎসব সম্ভোগ করিবার ক্ষেত্র। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সবান্ধবে উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।

যাঁহারা বিদেশ হইতে আসিবেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ১৫ই আশ্বিন (১লা অক্টোবর) মধ্যে অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভৌমিক মহাশয়কে পত্র লিখিয়া জানাইবেন। তাঁহাদের আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত কুমিল্লা অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ হইতে করা হইবে। সকলে বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন।

অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়।

(১) ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন। (২) ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। (৩) ব্রাহ্মসমাজে পরস্পরের সহিত আত্মীয়তা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত প্রীতি স্থাপন। (৫) অনাথ ব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ধনভাণ্ডার। (৬) বিবিধ—(১) সম্মিলনীর নূতন বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন ও কর্ম্মচারী নিয়োগ (২) অন্যান্য।

বিনীত	বিনীত
শ্রীমথুরানাথ গুহ	শ্রীরজনীনাথ নন্দী
সম্পাদক	সভাপতি
পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী	কুমিল্লা অভ্যর্থনা কমিটি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—বর্ষ শেষ হইল; সভ্যগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের বর্ত্তমান বর্ষের দেয় বার্ষিক চাঁদা সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। প্রবন্ধপ্রসূন—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, এম এ, প্রণীত—দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ৫০ আনা। অসুস্থ শরীরেও যে ললিত বাবু বর্দ্ধিত আকারে এই আবশ্যকীয় পুস্তকখানার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ইহাতে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। ইহাতে ধর্ম্মজীবন, উপাসনা তত্ত্ব, সেবা ধর্ম্ম ও বৃত্তি বিভাগ—প্রধানতঃ এই চারিটি বিষয় তত্ত্ব ও সাধনের দিক হইতে আলোচিত হইয়াছে। শেষে ব্রাহ্মসমাজের বাণী বিষয়েও একটি প্রবন্ধ আছে। ইহা পাঠে ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিমাত্রই উপকৃত হইবেন। ধর্ম্মপথে প্রথম প্রবেশার্থী ব্যক্তিদিগের সকলেরই ইহা পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। ললিতবাবু পূর্ব্বের ন্যায় এই সংস্করণেরও পুস্তকগুলি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করিয়াছেন। ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রচার কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

২। The Brahma Sútras—পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক দেবনাগর অক্ষরে মূল ও সংস্কৃত টীকা এবং ইংরাজী ভাষ্য ও টীকার ইংরাজী অনুবাদ সহ প্রকাশিত। মূল্য ৪৲ চারি টাকা। টীকা ও ভাষ্য ও টীকার কতকাংশের অনুবাদ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নিজের কৃত। টীকার অপরাংশের অনুবাদ সতীশ বাবু করিয়াছেন এবং তত্ত্বভূষণ মহাশয় দেখিয়া দিয়াছেন। সুতরাং প্রধান ভাবে তত্ত্বভূষণ মহাশয়ই ইহার সম্পাদক। ইতি পূর্ব্বে রায় বাহাদুর গুরুপ্রসাদ মিত্র, রাজর্ষি রামমোহনের বঙ্গানুবাদ সহ ব্রহ্মসূত্র বাঙ্গলা অক্ষরে প্রকাশ করেন। তাহার ব্যবহার বাঙ্গালা দেশেই আবদ্ধ থাকিবে। এই ইংরাজী সংস্করণ সকল দেশে ইহার প্রচার বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিবে। ব্রহ্মসূত্র উপনিষদের ব্রহ্মবাদ বিষয়ক বিচার গ্রন্থ। ইহার সকল মতের সঙ্গে সকলের সম্পূর্ণ মিল না হইলেও প্রত্যেকেরই ইহা পাঠ করা উচিত। ভাষ্যকারদের মধ্যেও মতভেদ আছে। তত্ত্বভূষণ মহাশয়ও যেখানে যেখানে আবশ্যক বোধ করিয়াছেন আপনার দার্শনিক মতানুযায়ী তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা দেবনাগর অক্ষর ও সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাঁহারাও ইংরেজী ভাষ্য ও টীকার অনুবাদ হইতে সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। তত্ত্বভূষণ মহাশয় যে বৃদ্ধ বয়সেও এই কার্য্যটি সম্পন্ন করিতে পারিলেন, ইহা নিতান্তই আনন্দের বিষয়। ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার বিষয়ে বিশেষ সহায়তা হইবে। ভাষ্য ও টীকা বেশ সরল সহজবোধ্য হইয়াছে। আমরা আশা করি ইহা সর্ব্বত্র সম্যক্ সমাদৃত হইবে।

ব্রাহ্মপরিবারের লোক সংখ্যা গণনা (Census)

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর গত বার্ষিক অধিবেশনে সম্মিলনীর কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রতি, আসাম, বাঙ্গলা ও বিহার—তিন প্রদেশের ব্রাহ্ম সংখ্যা গণনার (Census গ্রহণের) ব্যবস্থার ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। তদনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা একটি Census কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই কমিটি কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহায়তা গ্রহণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং Census গ্রহণের জন্য মুদ্রিত ফরম প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বত্র পাঠাইতেছেন। তিন প্রদেশের ব্রাহ্মসমাজের যোগে Census গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। মুদ্রিত ফরম যদি ভুল বশতঃ কোথাও পাঠান না হইয়া থাকে, কিম্বা যদি কেহ Census গ্রহণ সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সম্মিলনীর সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলেই প্রয়োজনীয় সংবাদ কিম্বা Census ফরম পাইতে পারিবেন।

এই গুরুতর কার্য্য সুনির্ব্বাহের জন্য Census কমিটি ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট বিনীত ভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই সাহায্য না পাইলে কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।

বিনীত—

3, Foulder Street, শ্রীমথুরানাথ গুহ—সম্পাদক,
Wari P. O., Dacca. পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী।

বিজ্ঞাপন

অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়ন সম্বন্ধে অবান্তর নিয়মের ২য় নিয়মানুসারে জানান যাইতেছে যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে সকল সভ্য অধ্যক্ষ সভার আগামী বৎসরের (১৯৩৩) সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের নাম, ঠিকানা এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বিবরণ আগামী ২১শে নভেম্বর (১৯৩২) কিংবা তৎপূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অফিসে পাঠাইবেন। সভ্যপদপ্রার্থীর আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হওয়া প্রয়োজন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্ততঃ তিন বৎসর সভ্য থাকা আবশ্যক এবং অন্যূন ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়া চাই।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১লা অক্টোবর ১৯৩২

শ্রীবরদাচরণ সেন,
সম্পাদক,
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ কর্ত্তৃক ১৬ই আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ

Registered No. 56

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতি র্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৫ ভাগ
১৩শ সংখ্যা।

১লা কার্ত্তিক, মঙ্গলবার ১৩৩৯, ১৮৫৪ শক,
ব্রাহ্মসংবৎ ১০৩
18th October, 1932.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে পবিত্রস্বরূপ জীবনবিধাতা, তোমার পূর্ণ পবিত্রতার দ্বারা শুদ্ধ সুন্দর করিয়া, অনন্ত উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করিবার জন্যই, তুমি আমাদিগকে গড়িয়াছ, এবং নিয়ত তৎসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছ। এই জন্যই তুমি সর্ব্বদা আমাদের প্রাণে মহৎ আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিতেছ, সমস্ত উদাসীনতা অবহেলা ও ক্ষুদ্র মলিন ভাবকে তিরস্কৃত করিতেছ, এবং কোনও বিষয়ে তোমার নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া চলিলে, যথোচিত শাস্তি বিধান করিয়া, অনুতপ্ত চিত্তে তোমার পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিতেছ। তথাপি কেন যে আমাদের চৈতন্যোদয় হয় না, আপনার প্রকৃত স্বার্থ ও কল্যাণের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, আত্মশুদ্ধির কথা ভুলিয়া, বাহির লইয়াই ব্যস্ত হই, মিথ্যা পবিত্রতার আবরণে আবৃত হইয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠি, এবং আপনার প্রকৃত অবস্থার দিকে না চাহিয়া ও অপরের উদ্ধারসাধনের জন্য অধিকতর ব্যস্ত হইয়া, নিজের ও অপরের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া মহা অকল্যাণ উৎপন্ন করি, জানি না। হে হৃদয়দর্শী দেবতা, তুমি আমাদের অন্তরের সমস্ত গূঢ় পাপ আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ কর, এবং তাহার জন্য যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাহাতে আমরা প্রত্যেকে সর্ব্বোপরি সম্পূর্ণরূপে তোমার অনুগত হইয়া ও তোমার পূর্ণ পবিত্রতার পথ অনুসরণ করিয়া, শুদ্ধ সুন্দর হইতে এবং নিজের ও অপর সকলের প্রকৃত উন্নতি ও কল্যাণ সাধন করিতে পারি, আমাদিগকে সে বুদ্ধি ও শক্তি প্রদান কর। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে সকল বিষয়ে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

চয়ন

১। যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ঈশ্বরসর্ব্বস্ব হইয়া ইহলোক ও পরলোকে কেবল তাঁহাকেই চায়, সে-ই বিরাগী।

২। ইহলোক পরলোক এক রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশ মাত্র, এক ভবনের ভিন্ন ভিন্ন ঘর মাত্র।

৩। যদি ঈশ্বর তোমাদিগকে দুঃখানলে দগ্ধ করেন, ঘোর বিপদে নিক্ষেপ করেন, তখন মনে করিও না যে ঈশ্বর তোমাদিগকে ছাড়িয়াছেন। তিনি বিপদদ্বারা আত্মাকে প্রস্তুত ও উপযুক্ত করেন।

৪। তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যে যে ব্যক্তি অশ্রুপাত করিয়া বপন করে, সে নিশ্চয়ই আনন্দের সহিত শস্য সংগ্রহ করে।

৫। স্বর্ণ একবার অগ্নিতাপে তাপিত না হইলে কখনই বিশুদ্ধ মূর্ত্তি ধারণ করে না, হৃদয়ে আঘাত না করিলে তাহা হইতে অমৃত-প্রবাহ প্রসূত হয় না, অগ্রে কণ্টক-শয্যায় শয়ন করিয়া শোণিতপাত না হইলে আনন্দ লাভ অসম্ভব।

সম্পাদকীয়।

পরার্থপরতা ও স্বার্থত্যাগ—গত সংখ্যার আলোচনাতে আমরা দেখিয়াছি যে, আমাদের প্রকৃত স্বার্থে ও পরার্থে কোনও বিরোধ নাই, অনেক স্থলে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া পরার্থসাধনের দ্বারাই প্রকৃত স্বার্থ রক্ষিত এবং আনন্দ সুখ ও কল্যাণ লব্ধ হয়; আর, প্রেম আমাদের অতি শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সমস্ত ত্যাগ করিয়াও প্রেমকে অটুট রাখিতে হইবে, তাহার উপরই আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতি এবং কল্যাণ

নির্ভর করিতেছে, প্রেম ও ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করাতেই আমাদের বর্ত্তমান অধঃপতন ঘটিয়াছে, আমাদিগকে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে, এবং আরও কতকাল করিতে হইবে জানা নাই। কিন্তু আমাদের এমন কোনও স্বার্থ আছে কি না, যাহা কাহারও জন্যই বিসর্জ্জন করা যায় না, যাহা ত্যাগ করিলে অপরেরও প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় না, এবং এরূপ কি আছে যাহা প্রেম ও পরার্থপরতার খাতিরেও পরিত্যাগ করা যায় না, অথবা যাহার বিসর্জ্জনে বিশুদ্ধ প্রেম ও অপরের কল্যাণ ক্ষুন্নই হয়, সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। আমাদের জাতীয় জীবনে বর্ত্তমানে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, এবং যাহার মীমাংসা সাধনে নানা জনে নানা ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার পক্ষে এ বিষয়ে সামান্য একটু আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, বরং কিছু পরিমাণে আবশ্যক বলিয়াই অনুভূত হইবে, মনে হইতেছে। সকল পথই যদি প্রকৃত পক্ষে কল্যাণপ্রসূ হইত, তাহা হইলে নীরব থাকাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করিতাম। কিন্তু সাধু উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হইয়াও ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিলে, কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণই সাধিত হয়। এই জন্যই সকলের বিবেচনার জন্য বিষয়টা উপস্থিত করিতেছি।

দেশের যে সামাজিক ও ধর্ম্ম ব্যবস্থা অধিকাংশ লোককে নানা অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া অধঃপতিত অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে, তাহা, আমাদের আপন স্বার্থের একান্ত পরিপন্থী বলিয়া, বর্ত্তমানে আর কিছুতেই অন্ততঃ কিছু পরিমাণে শিথিল না করিলে চলে না, এ কথা আজ কাল সকলেই এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছেন। নিতান্ত গোঁড়া বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারাও আপনাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই পূর্ব্ব গোঁড়ামি অনেকটা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই যে সকলেই পূর্ব্ব স্বার্থ কিছু না কিছু পরিমাণে ছাড়িতে বাধ্য হইতেছে, তাহার মূলে কিন্তু প্রধানতঃ ক্ষুদ্র সাংসারিক স্বার্থবুদ্ধিই কার্য্য করিতেছে। এই স্বার্থবুদ্ধির কোনও প্রকার নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সাংসারিক বিষয়েও মহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থ পরিত্যাগ করা নিন্দনীয় নহে, বরং তাহা বাঞ্ছনীয়ই। তবে, অনেক স্থলেই যে এই সমস্তের মূলে ন্যায় ও প্রেম নাই, কিছুমাত্র ঈশ্বরানুগত্য নাই, এবং থাকিলে যে উহা অধিকতর বাঞ্ছনীয় হইত ও শ্রেষ্ঠতম স্বার্থই রক্ষিত হইত, সে কথা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে,—সে বিষয়ে কাহারও কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। জীবনকে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরানুগত করিয়া শুদ্ধ সুন্দর হইবার উপরেই আমাদের ও জগতের সমস্ত উন্নতি ও কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। এই হেতু জীবনের পূর্ণ পবিত্রতা সাধন অপেক্ষা উচ্চতর স্বার্থ ও লক্ষ্য আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং সেই মহত্তম স্বার্থটা পরিত্যাগ করা বা ভুলিয়া থাকা যে আমাদের সকলের পক্ষেই বিশেষ ক্ষতিজনক ও নিতান্ত অকর্ত্তব্য, সে কথা আমাদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণে রাখিতে হইবে। দুঃখের কথা, সকল সময়ে ও সকল বিষয়ে সে দিকে আমাদের দৃষ্টি ও লক্ষ্য থাকে না।

অনেকে যে আজকাল নিঃস্বার্থ পরোপকার বৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়াই নিম্ন শ্রেণীর উন্নতিসাধন-ব্রতে ব্রতী হইয়া থাকেন, এবং তাহার জন্য অশেষ প্রকার ক্লেশ স্বীকার ও স্বার্থত্যাগ করেন, তাহা আমরা সকলেই জানি। ইহা যে অতি কল্যাণকর ও মহৎ কার্য্য তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার মধ্যে যদি শুধু পরোপকার বৃত্তির চরিতার্থতাই লক্ষ্যস্থানীয় হয়, পরার্থপরতার দিকেই পূর্ণ দৃষ্টি থাকে, সেবার দ্বারা কৃতার্থতা পবিত্রতা ও ঈশ্বরানুগত্য লাভের কথা, আপনার পূর্ণতা ও প্রকৃত স্বার্থসাধনের কথা কিছুই মনে না থাকে, তবে ইহাও কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণই উৎপন্ন করে। যখন মনে করি, আমরা আমাদের কার্য্যের দ্বারা নিজের নানা প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কেবল অপরের উপকারই সাধন করিতেছি, তখন যে অলক্ষিতে আমাদের মন অহঙ্কারেই একটু স্ফীত হয়, এবং অপরকেও একটু কৃপার (বিশুদ্ধ প্রেমের নয়) চক্ষেই দেখা হয়, তাহা একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই স্পষ্ট অনুভূত হইবে। ইহাতে যে নিজের অধোগতি হয়, এবং অপরেরও পূর্ণ কল্যাণ সাধন করা যায় না, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। অপরের এই সেবা করিবার জন্য যে আমরা দায়ী, ইহাতে যে তাহাদের অপেক্ষা আমাদের নিজেরই অধিকতর উপকার সাধিত হয়, ইহার মধ্যে যদিও তাহাদের ও আমাদের উভয়েরই পূর্ণ স্বার্থ রহিয়াছে, তথাপি এই টুকু না করিলে যে আমরা নিজেই প্রকৃত উন্নতি ও মনুষ্যত্ব হইতে বহু পরিমাণে ভ্রষ্ট হইলাম, ইহা একটি অকাট্য সত্য। এই হেতু, পরোপকারসাধনের ভাব লইয়া নয়, কিন্তু অন্যের সেবা করিয়া উপকৃত ও কৃতার্থ হইবার, জীবনের পূর্ণতা সাধনের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত হইয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিবার, উপদেশই সকল দেশের ও সকল কালের সাধু মহাজনগণ দিয়া আসিতেছেন। অহঙ্কার আমাদিগকে পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করে বলিয়াই অতি গুরুতর পাপ বলিয়া পরিগণিত। অতি সাধু কার্য্যও ইহার সংস্পর্শে দুষ্ট ও অপবিত্র হইয়া যায়। ইহার সঙ্গে দয়া ও অনুগ্রহ থাকিতে পারিলেও, বিশুদ্ধ প্রেম ও ন্যায় কিছুতেই থাকিতে পারে না। সকল কার্য্যের মধ্যে হৃদয়ের বিশুদ্ধ প্রেম, পূর্ণ ন্যায় ও ঈশ্বরানুগত্যকে রক্ষা করিতে না পারিলে কোনও প্রকারেই কাহারও কল্যাণ নাই। এই হেতু এই শ্রেষ্ঠতম স্বার্থকে কোনও অবস্থাতেই বিসর্জ্জন করা যায় না। এই ভাবে কার্য্য করিলেই যে পূর্ণ প্রেম ও ন্যায়ও অক্ষুন্ন ভাবেই রক্ষিত হয়, এবং পরার্থও বিন্দু পরিমাণে খর্ব্ব হয় না, অটুটই থাকে, সে কথা অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

কেহ কেহ ভ্রান্ত সংস্কারবশতঃ মনে করেন যে, যাহারা হিন্দু সমাজের বাহিরে বা প্রান্ত সীমায় বাস করিতেছে, তাহারা পূর্ব্বপুরুষদের বা আপনাদের পূর্ব্বজন্মকৃত কোনও অজ্ঞাত অপরাধের জন্য পতিত বলিয়া, তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া উহার আশ্রয়ে আনয়ন করা কর্ত্তব্য হইলেও, এইজন্য তাহাদের 'শুদ্ধি'

একান্ত আবশ্যক। ইহার মধ্যে কেহ কেহ স্বার্থবুদ্ধির ও অপর অনেকে নিঃস্বার্থ পরোপকার ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করিতে পারেন। সমাজের কোন স্তরে এই সকল লোককে স্থান দেওয়া হইবে, সে সম্বন্ধেও বিস্তর মতভেদ ইঁহাদের মধ্যে দেখা যায়। এক্ষেত্রে খাঁটি ন্যায়ের দিকে কাহারও সমুচিত দৃষ্টি আছে বলা যায় না। তথাপি আমরা সে সকল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। ইঁহারা সকলেই সাধুভাবের দ্বারা চালিত হইয়াই কার্য্য করেন, এই সকল লোকের কল্যাণ সাধনই যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটা মহা অকল্যাণ লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যে পাপে পতিত তাহার জন্য যে শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কে কোন পাপে কতটা পাপী তাহা নির্ণয় না করিয়া যদি কাহারও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হয়, তবে তাহার দ্বারা কল্যাণের পরিবর্ত্তে যে অকল্যাণই সাধিত হয়, সে কথা সামান্য একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। পাপ পরিত্যাগ করিয়া সংশোধিত জীবন, বিশুদ্ধ পবিত্র জীবন লাভ করিবার জন্যই প্রায়শ্চিত্ত বা শুদ্ধি আবশ্যক। এই হেতু পাপের পরিষ্কার জ্ঞান থাকা যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যাহাদের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হয়, তাহাদের কোনও পাপ দেখা যায় না, অপর পক্ষে যাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিতেছেন, তাঁহাদের পাপের স্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। যদি স্বীকারও করিয়া লওয়া যায় যে, বর্ত্তমান পতিত জাতিদের কোনও অতি দূরতম পূর্ব্বপুরুষের অজ্ঞাত পাপের ফলেই তাহারা পতিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা হইলেও তাহাদের পাপ প্রমাণিত হয় না, অথবা সে পাপের কোনও প্রকার জ্ঞান না থাকাতে তাহাদের পক্ষে বর্ত্তমানে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাহাদের জন্য শুদ্ধির কোনও প্রয়োজনই নাই। কিন্তু যাহারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য তাহাদিগকে এতদিন পতিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের উন্নতি ও বিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া, সকল প্রকার অধিকার ও সুযোগ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া, তাহাদের মনুষ্যত্বকে সমূলে বিনষ্ট করিয়াছে, অথবা ভ্রান্ত সংস্কার প্রসূত অন্যায় ব্যবস্থার ফলভোগ করিতে যাইয়া পরস্বাপহারী ও পাপের অংশী হইয়াছে, ন্যায়-বুদ্ধিকে খর্ব্ব করিয়া আপনাদিগকে অধঃপতিত করিয়াছে, সে সকল স্বার্থপর ও পাপভাগী উচ্চ শ্রেণীর লোকদের স্বকীয় ও পূর্ব্বপুরুষদের মহাপাপের যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আপনাদের শুদ্ধিসাধন করাই যে সর্ব্বোপরি অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই।

এতদর্থে অন্যায়রূপে অপহৃত দুই একটা অধিকার তাহাদিগকে পুনঃ প্রদান করিলেই যে যথেষ্ট হইল তাহা নহে, আপনাদিগকে তাহাদের অবস্থায় স্থাপিত করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে পূর্ব্ব অবিচার অত্যাচারের শাস্তি গ্রহণ করিলেই সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। অবশ্য, এখন ততটা করিবার প্রয়োজন নাই, তাহা সম্ভবপরও নহে। কিন্তু নিজেদের অনেক ন্যায্য অধিকার অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য খর্ব্ব করিয়াও, কতকটা ক্ষতিস্বীকার করিয়াও, তাহাদিগকে অধিকতর সুযোগ ও অধিকার প্রদান দ্বারা আংশিক ক্ষতিপূরণ না করিলে, তাহাদের দ্রুত উন্নতিসাধনে বিশেষ সাহায্য না করিলে, চলিবে না। তাহা ব্যতীত কিছুতেই নিজেদেরও কল্যাণ নাই, অপরের এবং দেশেরও প্রকৃত উন্নতির কোনও প্রকার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, মহাত্মা গান্ধী প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আত্মশুদ্ধি সাধনের জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত আছেন, এবং দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা দেশকে এই পথে চলিতেই আহ্বান করিতেছেন। তিনি কখনও তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত ও শুদ্ধির কথা বলেন না। বস্তুতঃ, কোনও যুক্তি বা ন্যায় বিচার অনুসারেই এরূপ কথা বলা যায় না,—বলিলে, অন্যায় অবিচার ছাড়া অধিকন্তু তাহাদিগকে অপমানিতই করা হয়, নিজেদের পাপের বোঝাই বর্দ্ধিত করা হয়। সূক্ষ্ম-ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, ইহার মধ্যে সত্য স্বার্থত্যাগও নাই, প্রকৃত পরার্থও নাই, আছে শুধু প্রচ্ছন্ন ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা। এরূপ ত্যাগশূন্য অত্যধিক বিকৃত পরার্থপরতা কাহারও পক্ষেই কল্যাণকর নহে, এবং নিতান্তই দোষাবহ। সুতরাং তাহাদিগকে কল্পিত পাপ হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা না করিয়া আপনাদিগকে সত্য পাপ হইতে মুক্ত করাতেই যে প্রত্যেক কল্যাণকামী ব্যক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থ নিহিত, এবং এরূপ স্বার্থ বিন্দু পরিমাণেও বিসর্জ্জন না দিলেই যে পরার্থও পূর্ণরূপে রক্ষিত হয়—ইহাই যে তাহার অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য, তাহা আর অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

যাহারা যথার্থতঃই পাপে ডুবিয়া পতিত হইয়াছে, তাহাদের উদ্ধারসাধন বিষয়েও একটা কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। যেখানে সত্য সহানুভূতি ও বিশুদ্ধ প্রেমই এরূপ কার্য্যের প্রেরক, হৃদয়ে অহঙ্কার প্রভৃতি কোনও নীচ ভাবই নাই, করুণ হৃদয়ের বিশুদ্ধ প্রেমে পরার্থপরতা ও স্বার্থত্যাগের অপূর্ব্ব পরিচয়ই দেখিতে পাওয়া যায়, আপাতদৃষ্টিতে সকলের পূর্ণ কল্যাণই রহিয়াছে মনে হয়, সেখানেও সূক্ষ্ম ভাবে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, উহার মধ্যেও একটা অকল্যাণের সম্ভাবনা রহিয়াছে, পরার্থপরতা ও স্বার্থ-ত্যাগের একটা সীমা আছে। আমরা যে অধিকাংশ সময়ই এই বাহিরের জগৎ লইয়াই ব্যস্ত থাকি, অন্তরজগতের দিকে আমাদের দৃষ্টি ও চিন্তা অতি অল্পই ধাবিত হয়, তাহা আমাদের সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বাহিরের দৃশ্যই অতি সহজে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় বলিয়া, অপরের পাপের ভীষণতা যে স্বতঃই প্রবল ভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহা অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। এই হেতু স্বভাবতঃই প্রেমিক হৃদয়ে তাহাদের উদ্ধারের জন্য বিশেষ আকুলতা জাগিয়া উঠে। এই ব্যাকুলতা ও তৎপ্রসূত কর্ম্মব্যস্ততা যতই প্রবল হয়, ততই আত্মচিন্তা ও আত্মপরীক্ষার অবসর যে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সাধারণতঃই

আমাদের অন্তরনিহিত পাপ সহজে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। এই অবস্থায় যে তাহা ধরা আরও বহুগুণে কঠিন হইয়া পড়ে, সে কথা বলা বাহুল্য। এই হেতু অনেক সময় এরূপ ঘটে যে, আমরা অপরের উদ্ধারের জন্য অত্যধিক ব্যস্ততা বশতঃ আপনার উদ্ধারের কথা ভুলিয়া যাই—আপনারা যে অলক্ষিতে কোনও গূঢ় পাপের কবলে পড়িয়া ধীরে ধীরে পতিত হইতেছি, এবং এই হেতু আমরা অপরের উদ্ধার সাধনেও যে সম্যক্ প্রকারে সফল হইতেছি না, তাহা বুঝিতেই পারি না।

বাহিরের সকল চেষ্টা আয়োজন অপেক্ষা জীবনই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। নিজে না উঠিলে অন্যকে অধিক দূর উঠান যায় না। নিজে শুদ্ধ সুন্দর না হইলে অপরকে তেমন শুদ্ধ সুন্দর করা যায় না। তাহা ছাড়া, নিজের গূঢ় পাপ অপরকেও কিছুটা নীচে নামাইবেই, অন্ততঃ তাহার উন্নতির পথে বাধা উৎপন্ন করিবেই। সুতরাং এ স্থলে সর্ব্বোপরি আপনার উদ্ধারের দিকেই, আপনার শুদ্ধতা ও পবিত্রতাসাধনের দিকেই অধিকতর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আপনার এই স্বার্থটাকে কোনও ক্রমেই অপর কিছুর জন্য বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না। অপরের উদ্ধারের চিন্তা একটু খর্ব্ব করিয়াও এবিষয়ে আপনার কল্যাণ সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে। এখানেও বস্তুতঃ প্রকৃত পরার্থে ও স্বার্থে কোনও বিরোধ নাই। তথাপি পরার্থপরতা ও স্বার্থত্যাগের যে একটা সত্য সীমা আছে, কোন কোন স্থলে স্বার্থত্যাগ ও অত্যধিক পরার্থপরতা যে অনিষ্টকরই হইয়া দাঁড়ায়, তাহাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের প্রেমকেও অবস্থা বিশেষে একটু খর্ব্ব ও সংযত করা আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধতা ও পবিত্রতাকে কখনও বিন্দু পরিমাণেও খর্ব্ব করা বা বিসর্জন দেওয়া যায় না। তাহা করিলে সর্ব্বপ্রকারে সকলেরই অকল্যাণ উৎপন্ন হয়। দুঃখের বিষয় এই সত্যটা আমরা অনেক সময়ই ভুলিয়া চলি। এইজন্যই আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের এরূপ শোচনীয় অধঃপতন ঘটিতেছে,—আমরা কিছুতেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না।

এ বিষয়ে আমরা সকলে সতর্ক হই। পূর্ণ পবিত্রতা ও ঈশ্বরানুগত্য লাভের জন্য সর্ব্বদা সকলে সচেষ্ট হই। আমাদের জীবনে ও সমাজে সর্ব্বোপরি পবিত্রস্বরূপের পুণ্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হউক। মিথ্যা পরার্থপরতার মোহে যেন আমরা সত্য কল্যাণকর স্বার্থ কিছুতেই ত্যাগ না করি। তাঁহার পবিত্র ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্ম-সম্মিলনীর

দ্বিচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন।

বিগত ৪ঠা অক্টোবর হইতে ৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত তিন দিন কুমিল্লা নগরে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে ন্যূনাধিক ৬০ জন ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকা সমবেত হইয়াছিলেন। স্থানীয় লোকেরাও উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

অধিবেশনের কয়েক মাস পূর্ব্বে একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হয়; শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী তাহার সভাপতি এবং শ্রীযুক্তা কুসুমমালা দত্ত ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভৌমিক সম্পাদক নিযুক্ত হন। অধিবেশনের কার্য্যে নেতৃত্ব করিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

৪ঠা অক্টোবর প্রাতঃকালে প্রারম্ভিক উপাসনা হয়। উপাসক-উপাসিকাগণের সমাগমে কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজের নবনির্ম্মিত মন্দির পূর্ণ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং 'ব্রাহ্মসমাজ একটি মিলিত ধর্ম্মপরিবার' এই বিষয়ে উপদেশ দেন।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হয়। সঙ্গীত ও প্রার্থনান্তে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি ত্রিপুরা জেলার প্রাচীন গৌরব, ঐ স্থানের ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস, ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি প্রভৃতি নানা বিষয় বর্ণনা করেন এবং বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত অতিথিগণকে সাদর সম্ভাষণে অভ্যর্থিত করেন।

তৎপরে রায় রাধাকান্ত আইচ বাহাদুরের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তীর সমর্থনে ও বিভিন্ন স্থানের কয়েকজন প্রতিনিধির অনুমোদনে, অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কার্য্যে বৃত হন।

আসন পরিগ্রহ করিয়া তিনি যে অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহাতে ধর্ম্ম, সমাজসংস্কার ও জাতিগঠন বিষয়ে অনেক মূল্যবান তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। প্রথমে তিনি বলেন, সংস্কার ভিন্ন মানবজীবনের কোনও বিভাগই ঠিক থাকে না; সকল বিভাগের সংস্কার পরস্পরসাপেক্ষ এবং ধর্ম্মবিশ্বাসই সকল প্রকার সংস্কারের মূল উৎস। এই বলিয়া তিনি উন্নত ধর্ম্মের কতকগুলি লক্ষণ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ভয়ের উপরে বা লোভের উপরে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নয়। সাংসারিক বিষয়ের জন্য প্রার্থনা, এমন কি, চরিত্রের সদ্গুণ লাভের জন্য প্রার্থনাও ধর্ম্মজীবনের উচ্চতম অবস্থা নয়। মানুষ যখন ভগবানের সান্নিধ্য সর্ব্বদা অনুভব করে, বিস্ময় ও আনন্দের সহিত স্বাভাবিক ভাবে তাঁর স্তুতি করে, এবং তাঁর সহযোগী হইয়া সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকে, সেই অবস্থাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা। ঈশ্বরের গুণানুবাদ অতি স্বাভাবিক কার্য্য। তাহাতে তাঁহার কোনও লাভ-ক্ষতি হয় না, আমাদেরই উপকার হয়। উপাসনা দুই প্রকার—ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত। উভয়ই উপকারী ও আবশ্যক। কিন্তু 'মহৎবাক্যের উপলব্ধিহীন অচিন্তিত আবৃত্তি' সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত। আদর্শে পৌঁছিতে না পারিলেও যদি তজ্জন্য চেষ্টা থাকে, তবে লজ্জিত হওয়ার কারণ নাই। শতবার পতন হইবে, তথাপি আদর্শে পৌঁছিতে চেষ্টা করা উচিত; কিন্তু আদর্শহীন জীবন বাঞ্ছনীয় নহে।

তৎপরে, স্বাধীন চিন্তার পথই যে সত্য পথ, তাহাতে যে মানবসমাজে ঐক্য স্থাপনের ব্যাঘাত হয় না, এ কথা বুঝাইয়া, সভাপতি মহাশয় একেশ্বরবাদের অবতারণা করেন। একেশ্বর-বাদই জাতীয় একতার মূল। একেশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াই মহাত্মা রামমোহন রায় জাতীয় একতা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। একমাত্র তাঁহার প্রবর্ত্তিত উপাসনাই সার্ব্বজনীন উপাসনা। ইহা অবলম্বিত হইলে ভারতীয় জাতি গঠনের সহায়তা হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, সংস্কারের জন্ম ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্মের জন্যই সংস্কার। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মের জন্যই সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লৌকিক সুবিধার জন্য সংস্কার করিলে, তাহাতেও উপকার হয়; কিন্তু ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যে সংস্কার, তাহাই যথার্থ সংস্কার; তাহাতেই আমূল পরিবর্ত্তন হয়।

তৎপরে কয়েকটি অত্যাবশ্যক সংস্কারের কথা বলিয়া সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ শেষ করেন। সেগুলি এই:-(১) দেশে শিক্ষা বিস্তার, (২) দারিদ্র্য দূরীকরণ, (৩) গার্হস্থ্য জীবনে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, (৪) ধর্ম্মানুগত জীবন দেখাইয়া ধর্ম্মের প্রতি লোকের ঔদাসীন্য ভাব হ্রাস করা, (৫) শ্রমিক ও কৃষকদের উন্নতি সাধন, (৬) রাজনীতিকে বিশুদ্ধ করা, (৭) সাহিত্যকে পবিত্র রাখা ইত্যাদি।

সর্ব্বশেষে বলেন, নির্ম্মল জীবন, বিশুদ্ধ দৃষ্টিই প্রচারক-জীবনের প্রধান সম্বল। মিলিতভাবে প্রচারকার্য্য করিতে হইলে ধনবল, জনবল, সবই আবশ্যক; কিন্তু সাধুজীবন, সরলচিত্ত গৃহস্থ জীবনই প্রচারের প্রধান আয়োজন।

অভিভাষণ সমাপ্ত হইলে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে সায়ংকালীন উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। "য এষঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি" এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া তিনি উপদেশ দেন। মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় হইতে মহাত্মা গান্ধীর সময় পর্য্যন্ত এক শত বৎসরে দেশ কতখানি অগ্রসর হইয়াছে, তাহার বর্ণনা করিয়া, তিনি শ্রোতৃবর্গকে বিশ্বাসী ও আশাশীল হইতে উৎসাহিত করেন। তৎপরে মহাত্মা গান্ধীর জীবনের মহত্ত্ব কোথায় তাহার আলোচনা করিয়া বলেন যে, তিনি পরমেশ্বরের আলোকের পথে আপনার জীবনকে স্থাপন করিয়াছেন এবং সর্ব্বাবস্থায় পরমেশ্বরের নির্দ্দেশে চলিবার জন্য আপনাকে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার শক্তি। এইরূপ মহাজনেরা ইতিহাস সৃষ্টি করেন; আমরা সাধারণ মানুষ ইতিহাস দেখি ও লিখি মাত্র। বর্ত্তমানে এদেশে যে ইতিহাস রচনা হইতেছে, তাহার তুলনা নাই। ধন্য আমরা, যে এ-যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছি! এ সকল ব্যাপারকে মানুষের দিক দিয়া দেখিলে তাহাকে বলা হয় ইতিহাস; ঈশ্বরের দিক দিয়া দেখিলে বলিতে হয় 'পুরাণ'। পরমেশ্বর ছোট বড় সকলেরই কাছে কিছু চান। আমরা যতই ছোট হই না কেন, আপনাদিগকে ঐ মহাজনগণের ন্যায় পরমেশ্বরের আলোকের পথে স্থাপন করিব, এবং তাঁর পথে চলিবার জন্য সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত থাকিব।

৫ই অক্টোবর প্রাতে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। তিনি 'সকল মানুষই অমৃতের পুত্র, এবং প্রত্যেকেই সাধুদের সঙ্গে সম-নাগরিক', এই বিষয়ে উপদেশ দেন। আপনাকে 'অমৃতের পুত্র' জানিয়া নিজেকে উন্নত করা, এবং সকলেই 'অমৃতের পুত্র' ও ধর্ম্মরাজ্যে 'সম-নাগরিক' এই জানিয়া সর্ব্বসাধারণের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা, আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

উপাসনার পর সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। প্রথমে সম্পাদক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ গত বৎসরের কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন; এবং কিঞ্চিৎ আলোচনার পর তাহা সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হয়।

তৎপরে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন' বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আলোচনা উত্থাপন করেন, এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নিজের ধর্ম্মজীবনের কোনও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

অপরাহ্নে তৃতীয় অধিবেশনে ঐ বিষয়ে আরও আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার সাধন বিষয়ক অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।

অতঃপর 'ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার' বিষয়ে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আলোচনা উত্থাপন করেন। সম্মিলনীর সংশ্রবে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে যে প্রচার কার্য্য শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বিশ্বাসের দ্বারা কয়েক বৎসর যাবৎ চলিতেছে, সতীশবাবু সেই বিষয়ে বিস্তৃত রূপে বলেন; এবং এই কার্য্যে সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী, অশ্বিনী কুমার বসু, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, বরদাপ্রসন্ন রায়, অন্নদাচরণ দাস, অক্ষয়কুমার সেন, মহেন্দ্রনাথ সেন, ও সভাপতি মহাশয় 'প্রচার' বিষয়ক আলোচনায় যোগদান করেন। ফলে স্থির হয় যে, সম্মিলনীর সভ্যগণের নিকট নিয়মিত চাঁদার অতিরিক্ত প্রচারার্থ বার্ষিক এক টাকা চাঁদা চাওয়া হইবে এবং তদ্দ্বারা একটি 'প্রচার ফণ্ড' গঠন করা হইবে। এই ফণ্ড হইতে প্রয়োজনানুরূপ প্রচারকগণকে বৃত্তি অথবা পাথেয় দান করা হইবে। ইহাও স্থির হয় যে, শ্রীযুক্ত হরানন্দ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন ও শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু সম্মিলনীর পক্ষ হইতে প্রচার কার্য্য করিবেন এবং উক্ত ফণ্ড হইতে তাঁহাদের পাথেয় বহন করা হইবে।

সভ্যগণ হইতে নিয়মিত চাঁদা ও উপরোক্ত অতিরিক্ত চাঁদা সংগ্রহ করিবার জন্য এবং অন্যান্য কার্য্যে সহায়তার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্মিলনীর প্রতিনিধি নিযুক্ত হন:— কলিকাতায় শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ দেব, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী বসু ও শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দত্ত; চট্টগ্রামে শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রকুমার দাস, বরিশালে শ্রীযুক্ত কল্যাণ কুমার চক্রবর্ত্তী; ময়মনসিংহে শ্রীযুক্ত হরানন্দ গুপ্ত; শ্রীহট্টে শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চৌধুরী; কুমিল্লায় শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা সিংহ; ধুবড়ীতে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র নাগ; এবং পাটনায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চৌধুরী।

সায়ংকালে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী 'ভাবী ভারতে ধর্ম্মের প্রকৃতি' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ভারতে এখন যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে ও অদূর ভবিষ্যতে যে অবস্থা উপস্থিত হইবে, তাহার উপযোগী হইতে হইলে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সকলে কি কি ভাব প্রবল ও প্রধান হওয়া আবশ্যক, বক্তা তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করেন।

৬ই অক্টোবর প্রাতঃকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি 'ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধানে পরমেশ্বরের করুণা' বর্ণনা করিয়া উপদেশ দেন।

তৎপরে 'ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ' বিষয়ক আলোচনা সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উত্থাপন করেন। (আলোচনা আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে একজন বৈষ্ণব ভিখারী আসিয়া সভাপতি মহাশয়কে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন এবং সসম্ভ্রমে প্রণাম করেন)। সভাপতি মহাশয় আলোচ্য বিষয়ে যাহা বলেন, তাহাতে শ্রোতৃবর্গ আর আলোচনার প্রয়োজন নাই মনে করিয়া, পরবর্ত্তী বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথিত বিষয়গুলি পরে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যাইবে।

অতঃপর 'ব্রাহ্মসমাজে পরস্পরের সহিত আত্মীয়তাবৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত প্রীতিস্থাপন' বিষয়ে আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আলোচনা উত্থাপন করেন, এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, গগনচন্দ্র রায়, অন্নদাচরণ দাস, ধীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার সেন, রজনীনাথ নন্দী, ও সভাপতি মহাশয় কিছু কিছু বলেন।

অপরাহ্ণে সম্মিলনীর শেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে প্রথমেই, সম্মিলনীর যে সকল সভ্য ও ব্রাহ্মসমাজের অপর যে কয়েকজন দেশসেবক বিগত বৎসরে পরলোক গমন করিয়াছেন, সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

তৎপরে, (১) আগামী বৎসরের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হয় এবং কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হন। (২) বাঙ্গালা বিহার ও আসামের ব্রাহ্মদের সংখ্যা-গণনার জন্য যে আয়োজন হইয়াছে তৎসম্পর্কে আনুমানিক দুই শত টাকার প্রয়োজন। উক্ত তিন প্রদেশের ব্রাহ্মসমাজসকলকে অনুরোধ করিয়া এই টাকা সংগ্রহ করা হউক, এই মর্ম্মে একটি নির্দ্ধারণ গৃহীত হয়। (৩) আগামী বৎসরে সম্মিলনীর অধিবেশন বরিশালে হওয়া বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হয়। (৪) সম্মিলনীর নিয়মাবলীতে যে সকল পরিবর্ত্তন সময় সময় হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিবার ও নূতন নিয়ম কি কি হওয়া উচিত তাহা প্রস্তাব করিবার জন্য একটি সব্-কমিটি গঠিত হয়। (৫) সভ্যদিগের মধ্যে যাঁহাদের নিকট তিন বৎসরের অধিক চাঁদা বাকী পড়িয়াছে, তাঁহাদিগকে জানাইয়া তাঁহাদের নাম খারিজ করা যাইতে পারে, এরূপ নির্দ্ধারণ হয়। (৬) সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার যে ঋণ হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, স্থির হয়; এবং সভাপতি মহাশয় ঋণশোধের জন্য ১০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন।

তৎপরে 'অনাথ ধন ভাণ্ডার' সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই ভাণ্ডারের অন্যতম ট্রাষ্টী Mr. S. C. Bose, M. A., পদত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ট্রাষ্টী নিযুক্ত হন। পূর্ব্ব সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষকেই আগামী বৎসরের জন্য নির্ব্বাচন করা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এই ভাণ্ডারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়া ইহার জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, দানবিহীন অনুষ্ঠান ব্রাহ্মসমাজে হওয়া উচিত নয়; এবং এই ভাণ্ডারের সাহায্যার্থ প্রত্যেক সমাজ-মন্দিরে দানাধার স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি নিজে এই ভাণ্ডারের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিবেন, এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সভাপতি মহাশয় এক বৎসরের জন্য মাসিক এক টাকা হিসাবে ১২৲ টাকা 'অনাথ ধন ভাণ্ডারে' দিবার সঙ্কল্প জানান।

এই সময়ে মৌলবী খালেদোর্ রহমান্ নামক এক শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতা বলিলেন, ধর্ম্মসমাজের চাঁদা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক একেশ্বরবাদীই সত্যধর্ম্মের প্রচারক। প্রচার কার্য্যে বাহির হইয়া সাহায্য চাহিলে সকলেই সাহায্য করিবে। কেহ চাঁদা দিতে না পারিলে, তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া সঙ্গত নয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হয় যে, আগামী বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে যে শত বার্ষিক উৎসব হইবে, তাহা যাহাতে ভালরূপে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য এই সম্মিলনী যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর সায়াহ্ন সাড়ে ছয় ঘটিকায় সকলে পুনরায় মিলিত হইলে, সভাপতি মহাশয় প্রার্থনা পূর্ব্বক উপসংহার সূচক কয়েকটি কথা বলেন। তৎপরে 'মানবিক নানা আদর্শের বিকাশ' বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতা হয়। যুদ্ধের বিরুদ্ধে, দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে, নারীর অধিকার বিষয়ে, পৃথিবীতে মানুষের আদর্শের যে বিকাশ হইতেছে, তাহা তিনি নানা যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী, মহিমচন্দ্র চৌধুরী, সুশীল-কুমার চক্রবর্ত্তী ও ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্মিলনীর সফলতা বিষয়ে যে কেহ সহায়তা করিয়াছেন সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

এবারকার অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্মিলনীর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন :—

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম এ, রায় বাহাদুর ভূধরচন্দ্র দাস, এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা সিংহ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভৌমিক, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র আইচ, শ্রীযুক্তা শশিমুখী সেন ও শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন দাস।

এইরূপে ভগবৎ কৃপায় তিন দিন ব্যাপী উৎসব নিরাপদে সম্পন্ন হয়। উৎসবে যে সকল উৎকৃষ্ট বক্তৃতা ও উপদেশ

হইয়াছে, এবং আলোচনাদি উপলক্ষে যে সকল মূল্যবান তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে, সমুদয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইল না। ক্রমে সে সকল প্রকাশ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাইবে।

মানব জীবন

(১৩)

প্রেম

মানুষের মধ্যে যত রকম মূল্যবান বস্তু,—শক্তি ভাব জ্ঞান আছে, তার মধ্যে প্রেম শ্রেষ্ঠ। জগতে যত মহৎ ও মঙ্গলকর বস্তু আছে, তার মধ্যে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রেম। প্রেম সব চেয়ে মহৎ, সব চেয়ে মূল্যবান, সব চেয়ে সুন্দর এবং সব চেয়ে সুমিষ্ট বস্তু। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে প্রেমের অধিকারী, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর।

বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাত্মাগণ শ্রেষ্ঠ হ'য়ে ছিলেন অসাধারণ প্রেমে। গান্ধীর শ্রেষ্ঠতা তাঁর প্রেমে। প্রেমের অভাবে মানুষ হীন হয়, এবং প্রেমের গুণে মানুষ মহৎ হয়। মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ন প্রেম।

প্রেম কা'কে বলে, প্রেম কি, প্রেমের লক্ষণ কি ভাল ক'রে জানা দরকার। এবং প্রেম কি নয়, তাও জানা আবশ্যক।

প্রেম মানেই অন্যকে ভালবাসা, অর্থাৎ অন্যের ভাল করা, অন্যের মঙ্গলসাধনের জন্য নিজের যা-কিছু আছে সব দেওয়া, পরিশ্রম করা, কষ্ট স্বীকার করা, নিজের সুখ ছাড়া, নিজের সুখ ও আরাম না-চাওয়া, অন্যের ভাল ক'রেই সুখী হওয়া, অপরের সঙ্গে সস্নেহ ভদ্র ব্যবহার করা। অপর পক্ষে নিজের মান সম্ভ্রম সুখ দুঃখ সব অগ্রাহ্য করা, অহঙ্কার না করা, কঠোর ব্যবহার না করা। এই সব প্রেমের লক্ষণ।

সাধারণতঃ প্রেমের এই উচ্চ ভাব মনে না থাকায়, প্রেমের নামে অনেক হীন বস্তুও জগতে চ'লে যায়। প্রেমের একটা আকর্ষণ আছে। যে যাকে ভালবাসে সে তাকে কাছে পেতে চায়। এই চাওয়া দুরকমের—(১) রাম শ্যামকে ভালবাসে অর্থাৎ রাম শ্যামকে কাছে পেতে চায়, এই জন্যে যে সে শ্যামের মঙ্গল করবে; (২) রাম শ্যামকে কাছে পেতে চায়, এই জন্যে যে শ্যামের দ্বারা সে নিজে সুখী হবে বা লাভবান হবে। এই দুই ভাবে কত পার্থক্য! এক ভাব হ'ল আপনাকে দিয়ে অন্যের মঙ্গল করা, অন্যকে সুখী করা, উন্নত করা; অন্য ভাব হ'ল অন্যের দ্বারা নিজে সুখী বা লাভবান হওয়া। প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ নিঃস্বার্থ সেবা, মঙ্গলসাধন, আপনাকে দেওয়া; নিজের সুখ ও স্বার্থ যেখানে লক্ষ্য, সেখানে প্রেম নাই।

ভাললাগা এবং ভালবাসা এক জিনিষ নয়। একটার মূলে ভোগ, অন্যটির লক্ষ্য ত্যাগ।

এক বাড়ীতে কয়জন বাস করলে এবং এক সঙ্গে খেলেই একটি পরিবার হয় না। দশ জনের মধ্যে যদি প্রেমের সম্বন্ধ থাকে, অর্থাৎ যদি সকলে পরস্পরকে ভালবাসে, অর্থাৎ পরস্পরের মঙ্গল চায়, তা হ'লেই পরিবার হয়। যে পরিবারের লোকদের অন্তরে যে পরিমাণে এই প্রেম আছে, সে পরিবারের লোকেরা সেই পরিমাণে সুখী এবং পরস্পরের সহায় ও মঙ্গলকারী। একটা পরিবারে ছোট বড় নানা রকম লোক থাকে, কত রকম প্রকৃতি থাকে, কত সুখ দুঃখ, রোগ শোক থাকে! যদি প্রেম না থাকে, তা হ'লে পদে পদে সকলে বিরক্ত হয়, অসুখী হয়, আর যদি প্রেম থাকে, তা হ'লে সকলে সকলের ভালমন্দ দোষ ত্রুটী সহ্য করে, ক্ষমা করে, এবং যাতে ভাল হয় তা-ই করে।

কেবল পরিবার নয়, সমাজও ঠিক থাকে না, সুখের স্থান থাকে না, যদি প্রেম না থাকে। স্বার্থপরতা প্রেমের বিপরীত ভাব। স্বার্থপর মানুষ নিজের সুখই চায়, কিন্তু নিজেও সুখ পায় না, অন্যকেও সুখ দেয় না। প্রেমিক মানুষ চায় অন্যের সুখ ও মঙ্গল, তার ফলে সে নিজেও বিমল সুখ পায়। যে সমাজের বেশী লোক স্বার্থপর, নিজের সুখ ও ধন মানের জন্যই ব্যাকুল, অন্যের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি নাই, সে সমাজের উন্নতি হয় না। সে সমাজে মানুষ সুখী হয় না।

দেশের সেবা এবং দেশের উন্নতির মূলেও প্রেম। যার হৃদয়ে দেশের জন্য অর্থাৎ দেশবাসীর জন্য যত প্রেম, সে-ই ততদূর দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। এই ত্যাগ কেবল টাকা দেওয়া নয়, ধন সম্পদ ছাড়া নয়। ধন সম্পদ ছাড়া, টাকা দেওয়া, এমন কি অনেক পরিশ্রম করা ও কষ্ট সহ্য করার মূলেও হীন ভাব ও ক্ষুদ্র লক্ষ্য থাকতে পারে। এই সকল ত্যাগ প্রেমের প্রকৃত পরিচয় নয়। প্রেমের প্রকৃত পরিচয়, চরিত্রের বিশুদ্ধতায়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র সুখ স্বার্থ যশ প্রভুত্ব গর্ব্ব অহঙ্কার প্রভৃতি ত্যাগে, এবং সত্যনিষ্ঠায়। যেখানে বাহ্য ত্যাগের সঙ্গে ছল চাতুরী, মিথ্যা কথা, হিংসা বিদ্বেষ, ইন্দ্রিয় সুখভোগে আসক্তি, যশ মানের ও প্রভুত্বের লালসা বর্ত্তমান, সেখানে ত্যাগের আড়ম্বর যত বড়ই হোক না কেন, সেখানে প্রেম নাই, কল্যাণ নাই।

বহু শক্তিশালী লোক, নানা রকম শক্তির জোরে বহু লোকের মধ্যে প্রবাণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারেন। তাতে বহু লোক মত্ত হ'তে পারে। তা দেখতে বেশ ভাল লাগে। কিন্তু উত্তেজনা যতই প্রচণ্ড হোক, যত বেশী লোকই তাতে মাতুক না কেন, যারা মাতায় এবং যারা মাতে তাদের মধ্যে কি পরিমাণ সত্যনিষ্ঠা এবং শুদ্ধ চরিত্র আছে, সে জন্যে তারা কতদূর ত্যাগস্বীকার করছে, তাই দিয়ে তাদের প্রেমের পরিচয়। দেশের ও সমাজের প্রকৃত শক্তি ও সম্পদ, প্রকৃত মহত্ত্ব ও আনন্দ—সত্যনিষ্ঠা এবং বিশুদ্ধ চরিত্রে।

সত্য ন্যায় শুদ্ধতা প্রেমের আশ্রয়। দেশবাসীকে যে পরিমাণে জ্ঞান বিচারে সত্যের অনুসন্ধান করতে সজাগ ক'রে তোলা যায়, যে পরিমাণে যা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত ব'লে বোঝা যায়, কাজে ও ব্যবহারে তার আচরণ করতে মাতান যায়, এবং সকলের উপরে, যে পরিমাণে বিশুদ্ধ চরিত্র লাভ করবার জন্য অনুরাগী করতে পারা যায়,—সেই পরিমাণে দেশকে উন্নত ও শক্তিশালী করা হয়। এই দিকে যার দৃষ্টি, এই জন্য যার সাধনা ও ত্যাগ, সে-ই প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক। নিজে মহৎ না হ'লে দেশকে উন্নত করা যায় না।

প্রেম প্রেম বল্লেই হয় না, হৈঃ চৈঃ কল্লেই হয় না। প্রেম শান্ত দৃঢ় গভীর, সত্য-ন্যায়-শুদ্ধতায় শোভন সুন্দর মহৎ;—ক্ষুদ্রতার, স্বার্থের, বিদ্বেষের দলাদলির অনেক উপরে থাকে; মানুষে মানুষে মঙ্গলসাধনের সম্বন্ধ বৃদ্ধি করে। এই প্রেমের সাধন চাই,—পরিবারে, বিদ্যালয়ে, হাটে বাজারে, সভা সমিতিতে, আমোদ আহ্লাদে, জাতীয় জীবনের সংগ্রামক্ষেত্রে।

(ক্রমশঃ)

কেশব স্মৃতি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ কেশবচন্দ্রের বিষয় উল্লেখ করিতে যাইয়া একটি গল্পের উল্লেখ করিতেছি। একবার ইংলণ্ডের রান্না ঘরে কোন মহিলা রান্না করিবার সময় তাঁহার অল্পবয়স্কা কোন কন্যাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছিলেন, এবং স্বর্গীয় দূতেরা (Angels) কিরূপ দেবভাবসম্পন্ন তাঁহারই বিষয় বর্ণনায় রত হইয়াছিলেন। বালিকাটি মাতার মুখ হইতে এই 'এঞ্জেলের' বিষয় শুনিতে শুনিতে বলিয়া উঠিল, "মা, আমি ত এঞ্জেল দেখিছি।" 'কোথায় দেখলে?' বালিকা এই মর্ম্মে তাহার বক্তব্য প্রকাশ করিল,—'কেন মা, ঐ যে সেদিন একজন লোক, খুব উঁচু যায়গার উপর দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া, কত লোকের কাছে, কি বলছিলেন। সেই ত এঞ্জেল।' কন্যা জন ওয়েস্‌লির উপদেশ-দানের বিষয় উল্লেখেই এই কথা বলিয়াছিল। আমরা অনেকেই জানি খৃষ্টীয় মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জন ওয়েস্‌লি যখন বক্তৃতা করিতেন, তখন সহস্র সহস্র শ্রমজীবী মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াই তাঁহার বাণী শ্রবণ করিত, আর অশ্রুজল তাহাদিগের গণ্ডস্থল সিক্ত করিয়া ফেলিত। জন্ ওয়েস্‌লির প্রচারের সময়ের ছবি আমি দেখিয়াছি। ভগবানের কথা, যীশুখৃষ্টের কথা, বলিবার সময় তাঁহার মুখের যে ভাব প্রকাশ পাইত, তাঁহার ছবিতেই সে আভাস পাইয়াছি। আমি যখন সে ছবি দেখিয়াছিলাম, তখন ওয়েস্‌লিকে আমিই দেবসদৃশ বা এঞ্জেল বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। ইংলণ্ডের ঐ বালিকা, ঐ মহাপুরুষকে স্বচক্ষে দেখিয়া কেন তাহার জননীর কাছে, এঞ্জেল দেখিয়াছি, বলিয়া স্বীকার করিবে না? মানব অন্তরের আধ্যাত্মিক জ্যোতি বাহিরেও প্রতিফলিত হইয়া পড়ে। ধর্ম্মবিজ্ঞানের ইহাই একটা চিরন্তন সত্য। বলিতে কি আমিও সেদিন সাতু বাবু লাটু বাবুর মাঠে শ্রমজীবিদিগের নিকট বক্তৃতার সময়, কেশবকে এঞ্জেলের ন্যায়ই মনে করিয়াছিলাম।

কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে আসিয়া 'সুলভ সমাচার' নামক এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করেন। বিলাতে সাধারণের পাঠের জন্য 'পেনি পেপার' দর্শনেই তাঁহার মনে ঐরূপ কাগজ বাহির করিবার বাসনা হয়। 'সুলভ সমাচার' বাহির হইলে, উহা ক্রয় করিয়া আগা গোড়া পাঠ করিতাম। সাধারণের জন্য ঐরূপ সংবাদ-পত্র প্রচার কেশবের একটা নূতন কীর্ত্তি বলিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে 'এডুকেশন গেজেট,' কি 'সোমপ্রকাশ' এইরূপ যে কয়েকখানি পত্রিকা ছিল, তাহা সাধারণ লোকের হাতে আসিত না। 'সুলভ সমাচার' প্রকাশিত হইলে, পত্রিকার উপরি ভাগে, এই কবিতাটি লিখিত হয়,—

"ধন মান লাভ করি, সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘ'টে উঠা দায়;
জ্ঞান ধর্ম্ম চাও যদি, অবারিত দ্বার,
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।"

কতকাল পূর্ব্বে এই কবিতাটি পড়িয়াছিলাম, কিন্তু আজ স্মৃতি হইতেই উহা এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। বেশ সুন্দর উপদেশ, সকল সময়ের পক্ষেই প্রযোজ্য।

কেশবচন্দ্র কয়েকটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা। তাহার মধ্যে "ভারত আশ্রম" ও "ব্রাহ্মনিকেতন" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটিতে ব্রাহ্ম প্রচারক মহাশয়েরা সপরিবারে বাস করিতেন। দ্বিতীয়টি ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের জন্য। এই শেষোক্ত নিকেতনে আমি অনেক সময়েই গমন করিতাম। উহা গোলদীঘির দক্ষিণ দিকের একটি বাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজদাস দত্ত, সীতানাথ দত্ত প্রভৃতি বাস করিতেন। আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইনি পরে বেথুন কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। শেষোক্ত দুই ব্যক্তি এই বৃদ্ধ বয়সেও গ্রন্থাদি রচনা করিতেছেন। দ্বিজদাস দত্ত, এম-এ, অধ্যাপক ছিলেন। আমি আমার বাল্যজীবনেই ইঁহাদের সংসর্গে আসিয়া সুখী হইতাম। কেশবচন্দ্র তাঁহার ঐ প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম নিকেতনে গমন করিয়া উপাসনাদি করিতেন। কিন্তু তত্ত্বাবধানের ভার ছিল স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের উপরে। ছাত্রদিগের নৈতিক জীবন গঠনের দিকে তাঁহার কি বিশেষ দৃষ্টিই নিপতিত হইয়াছিল! এই প্রতিষ্ঠানের একটা উৎসবের দিনের কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। সায়ংকালে নিকেতনের উপর তলায় অনেকে সমবেত হন। কেশবচন্দ্র সেন, তদীয় ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, প্রচারক অমৃতলাল বসু প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম পুরোহিত বাগ্মীবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিনকার এই উৎসবে আগমন করিবেন। দেখিতে দেখিতে কর্ম্মবীর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত হইলেন। সভা মধ্যে কেশব চন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করিলেন—অবশ্য তাঁহাদিগের নৈতিক চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যেই। শেষে সুন্দর রকমেই জলযোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমিও তাহার অংশীদার হইয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম। কালের খরতর স্রোতে বহু প্রতিষ্ঠানই আপনার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়াছে; কেশবচন্দ্রেরও ঐ দুইটি প্রতিষ্ঠান ও "ইণ্ডিয়ান রিফরম্ এসোসিয়েসন" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি পূর্ব্বোক্ত ভাবে বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের জানা আবশ্যক,

ধরাপৃষ্ঠ হইতে মানবের কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানসকল আপনাদিগের অঙ্গ বিলুপ্ত করিলেও, তাহাদিগের প্রভাব একেবারে বিনষ্ট হয় না,—উহাদিগের প্রভাব মানব সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া, অজ্ঞাতসারে শুভ ফলই প্রদান করিয়া থাকে। কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠানগুলির মঙ্গলপ্রদ প্রভাব বহু ব্রাহ্ম জীবনের দ্বারা সমাজে কার্য্য করিয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও করিবে। সত্যের প্রভাব অবিনশ্বর।

কেশবেরই জীবনের প্রভাবে আমরা সেই সময়ে কয়েকজন ছাত্র মিলিত হইয়া, একটি মণ্ডলী গঠন করিয়াছিলাম, আর তাহার নামকরণ করিয়াছিলাম, "শান্তিপূর্ণ ভ্রাতৃমণ্ডলী।" মণ্ডলীর অধিবেশন হইত প্রতি সপ্তাহে, কানাইলাল পাইন মহাশয়ের ভবনে। ইনি একজন তাৎকালিক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। কানাই বাবু উচ্চ দরের শিক্ষিত, ধনী, ও বড়ই কেশবভক্ত ছিলেন। আমাদের এই ক্ষুদ্র মণ্ডলীর অধিবেশনে আমরা উপাসনা ও ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতাম। কানাই বাবুর, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক মহাশয়দিগের, এমন কি মহাত্মা কেশবচন্দ্রেরও, উহার উপর স্নেহদৃষ্টি পড়িয়াছিল। এস্থলে কেশবচন্দ্রের একটি বিষয় উল্লেখ করিতেছি। আমরা আমাদের মণ্ডলীর সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিব স্থির করিলাম। উৎসবের কার্য্য কোন প্রচারকের দ্বারা সম্পন্ন হয়, এই উদ্দেশ্যে আমি কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ ভবনে (তখন তিনি সেইখানেই বাস করিতেন) গমন করিলাম। গিয়া দেখিলাম, কেশবচন্দ্র ছাদের উপর বেড়াইতেছেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে; তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেই, কেশব অতি মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"কি শান্তিপূর্ণ!" সে মুখের ভঙ্গী ও সেই মধুর হাসি আমি জীবনে কখনও ভুলিব না। তৎপর আমি আমার বক্তব্যের বিষয় তাঁহাকে জানাইলে, হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা শান্তিপূর্ণ, একদিন একটা কিছু করা যাবে;" ইত্যাদি। আমাদের ঐ মণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই জনের নাম, উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—গিরীন্দ্রমোহন গুপ্ত আর নগেন্দ্রনাথ মিত্র। ইঁহারা তখন বিদ্যালয়ের ছাত্র। পরে প্রথমোক্ত ব্যক্তি ওকালতী কার্য্যে নিযুক্ত হন; দ্বিতীয়, ইংলণ্ডে গমন করিয়া, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম এ, উপাধি লাভ করিয়া, ঢাকা সহরে কোন কলেজের গণিত বিদ্যার অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থায় ইঁহাদিগের জীবনের আদর্শ অনুকরণীয় ছিল। পরবর্ত্তীকালেও সে আদর্শের মনোহারিত্ব নষ্ট হয় নাই। এখন ইঁহারা দুইজনেই পরলোকবাসী। এ সকল কি কেশবেরই প্রভাব প্রকাশ করে না?

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে সময়ে বেনেপুকুরে স্থানীয় ব্রাহ্মেরা সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিতেন। এই সাম্বৎসরিক উৎসবে অনেক ব্রাহ্ম তথায় সমবেত হইতেন। এই উৎসব উপলক্ষে একবার আমাদের ঐ ক্ষুদ্রমণ্ডলীও নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। উৎসবের কার্য্য দুই বেলাই সম্পন্ন হইয়াছিল। সে দিন রবিবার। আমাদের মণ্ডলীর মধ্যে গিরীন্দ্রমোহন ও আমি তথায় সায়ংকালে যাইবার জন্য প্রস্তুত রহিলাম, কিন্তু সায়ংকালে তথায় যাইবার পূর্ব্বে আমরা এই মর্ম্মে দুই জনে একটু আলোচনা করিলাম, যে আজ সায়ংকালে আমাদের ত আর মন্দিরে যাওয়া হইল না এবং সেজন্য কেশবচন্দ্রকে আজ আর আমরা দেখিতে পাইব না। অবশেষে আমরা উভয়ে এই স্থির করিলাম যে মন্দিরে যখন উপাসনায় যোগদান ঘটিল না, তখন আমরা একবার তাঁহাকে দেখিয়াও উৎসবে যাইব। এইরূপ স্থির হইলে, আমরা মন্দিরে গেলাম। তখন কেশবচন্দ্র বেদীতে আরোহণ করিয়াছেন। আমরা একবার তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই গন্তব্য স্থানে গমন করিলাম। কেশবচন্দ্রের এই যে আকর্ষণী শক্তি, ইহা তাঁহার জড়দেহের অতীত কোন বিশেষ শক্তিরই প্রভাব ভিন্ন আর কি বলিব?

কেশবচন্দ্রের দানশীলতার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে দিতেছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মের সময় "ধর্ম্মবন্ধু" নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এজন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। আমার স্বর্গীয় ভ্রাতা অধরচন্দ্র পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু পত্রিকাখানি পরিচালনে শেষে অর্থের অভাব উপস্থিত হইল। এজন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি আবেদন পত্র লিখিত হয়। আমি ঐ আবেদন পত্র লইয়া কেশবচন্দ্র সেনের নিকট উপস্থিত হইলাম; তিনি জানিতেন যে আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোক। কিন্তু আমি তাঁহার নিকট আবেদন পত্রখানি ধরিবামাত্র তিনি উহা পাঠ করিয়াই ১০৲ টাকা সহি করিলেন; আর বলিলেন, 'তুমি কান্তি বাবুর কাছে গিয়া ইহা দেখাও।' আমি সেইরূপই করিলাম। কান্তিচন্দ্র উহা দেখিয়াই স্বাক্ষরিত চাঁদাটি আমায় প্রদান করিলেন। আর একটি দানের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। আমার বিশেষ পরিচিত একজন ব্রাহ্মণ-পত্নীর অনেকগুলি অলঙ্কার অপহৃত হয়। পত্নী সেজন্য ব্যথিত হইয়া পড়েন;—সে মনের কষ্টে ক্রমে উন্মাদের আকার ধারণ করিল। স্বামী স্ত্রীর এই অবস্থা দর্শন করিয়া, একটি আবেদন লিখিলেন। এই আবেদন লইয়া তাঁহাদের পুত্র (আমার বিশেষ পরিচিত) কেশবচন্দ্র সেনের নিকট গমন করেন। কেশব এই কারণে ১০৲ টাকা প্রদান করেন। এসকল দান কেশবের উদার হৃদয়ের পরিচায়ক।

আমাদের 'শান্তিপূর্ণ ভ্রাতৃমণ্ডলী' সুচারুরূপেই চলিতেছিল; শেষে কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহোপলক্ষে আমাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। কেহ ঐ বিবাহের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, কেহ শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রতিবাদকারীদিগের পক্ষে দাঁড়াইলেন। আমি শেষোক্তদলের প্রতিবাদ বিশেষ যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াই তাঁহাদের দলে প্রবেশ করিলাম, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরই একজন হইয়া গেলাম; মনে হইতে লাগিল, যথার্থই সত্যের পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম; আর এই সমাজই ব্রাহ্মধর্ম্মকে অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইবে। এই ভাবে তখন প্রাণটা যেন ভরপুর হইয়া থাকিত। 'শান্তিপূর্ণ ভ্রাতৃমণ্ডলী' এই আন্দোলনে পরস্পরমতভেদহেতু ভাঙ্গিয়া গেল। যে কেশব-

চন্দ্রের মধুর উপাসনায় যোগ না দিলে প্রাণে কষ্ট উপস্থিত হইত, যাঁহার প্রসন্ন বদন দেখিবার জন্ত প্রাণ সর্ব্বদাই উৎসুক হইত, আজ তাঁহা হইতে দূরে দাঁড়াইয়া প্রাণে যে ক্লেশ অনুভব করিলাম না, তাহা নহে; কিন্তু সে সময় কে যেন ভিতর হইতে বলিতে লাগিল,—'সত্য সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মধুরতর ও প্রিয়তর।' এই ভিতরের বাণী তখনও শুনিয়াছিলাম, এখনও শুনিতে পাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশি ভূষণ বসু

ব্রাহ্মসমাজের রীতি নীতি

গত ২৭শে আগষ্ট ১৯৩২, শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ব্রাহ্মবন্ধু সভার এক অধিবেশনে উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আলোচনা উত্থাপন করিয়া বলেন:—

ব্রাহ্মসমাজ একটি ধর্ম্মসমাজ ও সমাজ দুই-ই। সুতরাং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় আলোচনা করবার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করাও আমাদের বিশেষ দরকার। ধর্ম্ম ও নীতি মানুষের চিরন্তন শাশ্বত কল্যাণের বস্তু; এ সকলের পথে মানুষকে পরিচালিত করা ব্রাহ্মসমাজের কাজ। Policy of drift (স্রোতে ভাসিয়া চলার নীতি) ঠিক নয়। যা কালের চাপে হ'য়ে যাচ্ছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। সামাজিক রীতি নীতি যখন মানুষের চিন্তা ও চেষ্টার দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়, তখন তার ফল ভাল হয়, কালবশে পরিবর্ত্তিত হ'তে দেওয়া ঠিক নয়।

সামাজিক বিষয়ে অতি মাত্রায় নিয়ম করাও ঠিক নয়, আবার যা ইচ্ছা তাই করতে পাওয়াও ঠিক নয়। ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মণের ভয় নাই, চক্ষুলজ্জার ভয় থাকা উচিত। সমাজ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য এই যে, আমরা আমাদের চোখের দৃষ্টির দ্বারা পর্য্যন্ত অন্যায়কারীকে জানিয়ে দেব যে এটা অন্যায়, এটা পাপ। যে সমাজের মানুষগুলির মধ্যে এইরূপ জলন্ত দৃষ্টি নাই, তার অবস্থা শোচনীয়। সামাজিক রীতি নীতি বিষয়ে নানা দিক দিয়ে বলা য'য়। প্রথমতঃ, বিবাহের কথা আলোচনা করা যা'ক। বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আইনের নির্দ্দেশ আছে, কিন্তু লোকমতের নির্দ্দেশও থাকা উচিত। এ বিষয়ে একটি আদর্শ থাকা উচিত। আমাদের ব্রাহ্মসমাজে বিবাহের সাধারণ বয়স—পুরুষের ২৫, মেয়ের ১৮। শাস্ত্রী মহাশয় ১৬ বছরের কম বয়সের কোন মেয়ের বিবাহ দিতেন না। আমিও দিই না। ১৬ বছরও মেয়েদের পক্ষে খুবই কম বয়স, এই বয়সে বিবাহের যোগ্যতাও জন্মায় না, দায়িত্ববোধও জাগে না। ২১ বছরের আগে মেয়েরা বা ছেলেরা অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিতে পারে না। ২১ বছরের আগে বিবাহ একেবারে না হইলেই ভাল হয়।

বিবাহের বয়স কম রাখার পক্ষে দুইটি যুক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে—(১) মেয়েদের বেশী বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখা ও তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া—এই যোগ্যতা অনেক মা বাপের নাই। (২) বাঙ্গালীর আয়ু গড়ে ৪৫ বৎসর মাত্র। সুতরাং ২৫ বছর বয়সে বিবাহ করলে চলবে কেন? এত বয়সে বিবাহ করলে সে যথাসময়ে সংসারের দায়িত্বভার হ'তে মুক্তি পাবে কি ক'রে?

আপনারা এই বিষয়ে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করুন।

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দত্ত—ব্রাহ্মসমাজে বিবাহের বয়স গড়ে পুরুষের ২৫ ও মেয়েদের ১৮ আছে। কিন্তু বেশী বয়সে বিবাহ করার দৃষ্টান্তও আছে; বিপত্নীকেরা অনেক বেশী বয়সে বিবাহ করেন। তার ফল কি ভাল হচ্ছে?

সতীশ বাবু—খুব বেশী বয়সে বিবাহ না হওয়াই ভাল। কিন্তু এখন জীবনসংগ্রাম এত বেশী হ'য়ে পড়েছে যে, মানুষ শীঘ্র বিবাহ করতে পারে না। অনেকে বিবাহ করা ছেড়ে দিচ্ছেন।

শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ সেন—অনেকের style of living (চালচলন) এত উঁচু যে তার অনুরূপ অর্থোপার্জ্জন না করতে পারা পর্য্যন্ত অনেকে বিবাহ করতে চান না।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার—যে দিন কাল পড়েছে তাতে ছেলেদের ২৫ বছর ও মেয়েদের ১৮ বছরের আগে বিবাহ হওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়। ব্রহ্মদেশের লোকেরা আমাদের দেশে আইন ক'রে বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হয়—একথা শুনে হাসে।

সভাপতি মহাশয়—নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত শিক্ষা পেতে হ'লে মেয়েদের ১৮ বছরের কমে বিবাহ হওয়া কখনই উচিত নয়। ব্রাহ্মসমাজে সাধারণতঃ ১৮ বছরের পরেই মেয়েদের বিবাহ হয়। শিক্ষা শেষ না ক'রে মেয়েরা বিবাহ করে না, করা উচিতও নয়। শিক্ষা শেষ না ক'রে বিবাহ করার শোচনীয় ফল আমরা দেখে'ছ।

প্রসন্ন বাবু—মেয়েদের শিক্ষা ঠিক মত হ'লে তাদের প্রতি অত্যাচারও সহজে হ'তে পারে না।

মীমাংসা—বিবাহের সময় পুরুষের বয়স ২৫ ও মেয়েদের বয়স ১৮ হ'তে ২১এর মধ্যে হওয়া উচিত। বিবাহের আগে তারা উপার্জ্জনক্ষম হ'লে ভাল হয়।

বিবাহ সংঘটন কি প্রণালীতে হবে।

সতীশ বাবু—সুপরিচালিত বিবাহে অনুমোদন ও মনোনয়ন দুই-ই চাই কি না, চাইলে কোন্‌টি আগে চাই, এবং এই দুইয়ের সামঞ্জস্য কি ক'রে হবে—এই বিষয়ের আলোচনা করা যা'ক।

প্রসন্ন বাবু—অনুমোদন ও মনোনয়ন ভাল বিবাহে দুই থাকাই উচিত।

হরিনারায়ণ বাবু—মা বাবা ছেলে মেয়েদের বিবাহের বিষয় আগে মনে ঠিক ক'রে তারপর ছেলে মেয়েদের পরস্পরের সঙ্গে মিশতে দেবেন, যাতে তারাই পরস্পরকে মনোনীত করে।

সতীশ বাবু—মা বাবার অনুমোদন ও ছেলে মেয়েদের মনোনয়ন এ দুই-ই চাই। এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি আগে ও কোন্‌টি পরে তা বলা কঠিন, সব ক্ষেত্রে এক রকম হয় না। মা বাবার অনুমোদন সত্যই ছেলেমেয়েদের কল্যাণচিন্তা-প্রসূত হওয়া চাই। পরস্পরের সঙ্গে কি ভাবে মিশতে হবে, ছেলে

মেয়েদের তা শিক্ষা দেওয়া মা বাবার অতি গুরুতর কর্ত্তব্য। ছেলেমেয়ে ও মা বাবার মধ্যে হৃদ্যতা থাক্‌লে এ কাজটি সহজ হয়।

শিশিরবাবু—বেশী বয়সের ছেলেমেয়েদের কি এভাবে মা বাবাকে সব জানান সম্ভব? তারা কি বাবার উপদেশ চাইবে?

বরদাবাবু—ছেলে মেয়ে ও মা বাবার মধ্যে খোলা খুলি ভাব থাক্‌লে ছেলে মেয়েরা বেশী বয়সেও মা বাবাকে এ সকল বিষয় না জানিয়ে পারে না। তারা স্বভাবতঃই মা বাবার পরামর্শ চায়।

সভাপতি মহাশয়—অনেক সময় ছেলে মেয়েরা পরস্পরের চরিত্রের একটি দিক দেখেই আকৃষ্ট হয়। এ সকল ক্ষেত্রে মা বাবার সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে কথাবার্ত্তা হওয়ার বড়ই দরকার। মা বাবার কাছে ছেলে মেয়েদের এ সকল কথা বল্‌তে ভয় থাক্‌লে, অথবা মা বাবা এ সকল কথা বল্‌তে তাদের বাধা দিলে তার ফল বড়ই খারাপ হয়।

সতীশবাবু—অনেক ছেলে মেয়ের প্রণয়ে পড়া রোগ থাকে, তাদের সম্বন্ধে খুব সাবধান হওয়া দরকার। অল্প বয়সে, দায়িত্ববোধ জাগ্‌বার আগে প্রণয়ে পড়্‌লে তাদের বলা দরকার—এখন সময় নয়। বেশী আকৃষ্ট হ'য়ে পড়্‌লে বলা দরকার—অপেক্ষা কর, সংযত হও, যোগ্য হও।

সভাপতি মহাশয়—অনেক স্থলে বিবাহের সঙ্গে সাংসারিক লাভ ক্ষতির ভাব বড়ই বেশী মিশ্রিত থাকে। ছেলে মেয়ের বিবাহ দেবার সময় মা বাবার মনেও এই ভাব অনেক সময়ে থাকে। তার ফল বড় খারাপ হয়।

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ—আমরা এখানে যে সকল প্রস্তাব কর্‌ছি, সে সকল কাজে পরিণত করা বড়ই কঠিন। আমাদের সামাজিক প্রথায় ও মতে অনেক প্রভেদ আছে। সমাজে নানা রকমের, নানা স্তরের লোক আছেন। সকলে এ সকল বিষয়ে একমত হবেন না। সাধারণ সামাজিক নিয়ম কর্‌তে হ'লে সমাজের লোকদের মধ্যে অনেকটা একত্ব (uniformity) চাই। তার জন্য অনেকদিন ধরে এসব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া চাই; inform করা চাই। Information ও শিক্ষার খুব অভাব, অনেক লোকের এসব কিছুই নাই। সমাজে যাঁরা অভিজ্ঞ, শিক্ষিত লোক, তাঁরা আগে এ সকল বিষয়ে বলুন। শিক্ষার দ্বারা আগে সমাজে uniformity আনা দরকার, তারপর নিয়ম হবে। আমরা ছেলে মেয়েদের বেশী বয়সে বিবাহ দেব, তাদের উচ্চশিক্ষা দেব, অথচ তারা মা বাবার অনুমোদন ছাড়া বিবাহ কর্‌বে না, তা হ'তে পারে না। অনেক পরিবারে ছেলেমেয়েদের তাচ্ছিল্য করা হয়, তাদের সঙ্গে মা বাবা কোন যোগ রাখেন না, তারা বড় হয়ে মা বাবার কথা শুন্‌বে, এ অসম্ভব। উচ্চশিক্ষা ও স্বাধীনতা যাদের আদর্শ, তাদের বিবাহ সম্বন্ধে এরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করা যায় না। শিক্ষা দ্বারা যতটা একমত হ'তে পারা যায় তারই চেষ্টা করা উচিত।

সভাপতি মহাশয়—আমাদের এই সভায় যা আলোচনা হয় তার বিবরণ, আমাদের মতামত, সকলকে জানান দরকার। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা খুব আছে, মত গঠনের জন্য শিক্ষার নিতান্ত দরকার। এইরূপ সভা আরও হওয়া উচিত।

নূতন সঙ্গীত।

(১)

বাউল।

ক্ষ্যাপা দ্যাখ রূপসাগরে বাণ ডেকেছে,
প্রেমের জোয়ার ছুটেছে তায়।
আখরে ঐ নীল গগনে চাঁদের কোণে,
প্রাণ টানে কি রূপের মেলায়;
যেরূপ আকাশ বাতাসে, মেঘের পাশে,
ভেসে বেড়ায় তারায় তারায়॥
ধরণীর আসন তলে ফুলের দলে,
প্রেমের তুফান উথ্‌লে' নাচায়;
হেথা তোর ঘরের কোণে, তপোবনে,
ঝলকে তার কি ফুল ফোটায়!
চৌদিকে রূপের হাটে, রূপের মাঠে,
কোন মহাজন সে রূপ খেলায়;
প'ড়ে তুই ঘোর বিপাকে, মোহের ফাঁকে,
এক পলকে দেখ্‌লিনে তায়॥
সে যে, তোর হৃদ্‌-বিহারী, প্রাণের হরি,
রূপ-মাধুরী দেখা'তে চায়;
যদি রে দেখ্‌বি তাঁরে, পারাবারে
প্রেম জোয়ারে ঝাঁপ দিয়ে আয়॥

(২)

বাউল।

(ক্ষ্যাপা) মন আমার, প্রেম দরিয়ার
স্বরূপ চিন্‌লি না।
(তার) নাইকো তলা, নাই কিনারা রে,
নাইকো কোন সীমানা॥
প্রেম-সাগরের গতি একটানা,
অনায়াসে পারে যায় যে সাঁতার জানে না;
সে টানে দুর্ব্বলেরে সবল করে রে,
যে জল উজান্ চ'ল্‌তে জানে না॥
ঈশা মুষা নানক চৈতন্য
প্রেম সলিলে তুফান তুলে হ'য়েছেন ধন্য;
হ'লো কূলে ব'সে ঢেউ গোণা সার রে,
তুই ঝাঁপ দিতে তো পার্‌লি না॥
সাঁতার ভুলে পড়্‌রে জলে
তরঙ্গের টানে কূল পাবি অকূলে;
যদি অবশ হ'য়ে পড়িস্‌রে ট'লে,
তবু কাণ্ডারী তো ছাড়্‌বে না॥

শ্রীশচন্দ্র দাস

---

(৩)

করুণার বাণ ডেকে যায়,
আয় চলে যাই ডুব-জলে।
এযে গো করে সরস শ্রান্ত অবশ-দুর্ব্বলে।
বয়ে' যায় প্রেমে অধীর
উছল নদীর
শীতল ধারা;
ছুটে' আয় তৃষায় মরা
দুঃখ শোকের বিষে-জরা
থাকিস্‌নে দূরে তোরা, দিশেহারা।
শুষ্ক জীবন সিক্ত কর,
প্রাণ ভরে' প্রাণ স্নিগ্ধ কর,
সন্তাপে যার বুক জ্বলে।

—শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে:—

বিগত ২০শে আশ্বিন কটক নগরীতে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার হালদারের মাতা পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত ৩০শে আশ্বিন তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ২রা অক্টোবর পরলোকগত ডাক্তার বি, রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য এবং পুত্র শ্রীযুক্ত বীররুদ্র রায় জীবনীপাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে বিবিধ প্রতিষ্ঠানে ১০০৲ টাকা দান এবং কাঙ্গালী-ভোজনাদি হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন এবং আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ১৪ই অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে ধুলিয়ান নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ পালের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শান্তিপ্রভা ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘটকের চতুর্থ পুত্র শ্রীমান সুধীন্দ্রনাথের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র লাহিড়ী উপদেশ প্রদান করেন। প্রেমময় পিতা নব দম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ১০ই সেপ্টেম্বর ছাত্রসমাজের পক্ষ হইতে ব্রহ্মমন্দিরে একটী বিতর্ক সভা হয়; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য করেন। বাবু কিরণ চন্দ্র ঘোষাল, বর্ত্তমান সময়ে পুরুষের সঙ্গে নারী জাতির যে প্রতিযোগিতা চলেছে, ইহাতে সমাজের মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে একটী আলোচনা উপস্থিত করেন। অনেক ছাত্র এবং যুবক বন্ধু এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

৩রা সেপ্টেম্বর ছাত্র সমাজের এক অধিবেশনে সতীশ বাবুর সভাপতিত্বে বাবু সুধাংশুকুমার চৌধুরী "কবির সমাধি" বিষয়ে স্বরচিত একটী দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন। অনেক সভ্য এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

১লা আশ্বিন সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে ছাত্রসমাজের পক্ষ হইতে ঋষি রাজনারায়ণ বসুর স্মরণার্থ সভায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শরৎকুমার সেন বক্তৃতা করেন।

৩১ শে ভাদ্র সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ গুপ্তের ভবনে তাঁহার পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রীতি-জলযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাতে কল্যাণ-কুটীরে উপাসনা, সঙ্গীতাদি হয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী। সায়ংকালে মন্দিরে স্মরণার্থ সভা; সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস। বক্তৃতা করেন—রায় গণেশচন্দ্র দাস বাহাদুর, শরচ্চন্দ্র গুহ, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, মৌলবী হাসেমালী খান, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বর্গারোহণ দিনে—৩০শে সেপ্টেম্বর সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন সঙ্গীত, জীবন প্রসঙ্গাদি। আচার্য্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী। শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন প্রসঙ্গ করেন সত্যানন্দ বাবু এবং সতীশ বাবু।

দেরাদুন ব্রাহ্মসমাজ—গত ৩রা অক্টোবর, দেরাদুনে, পরলোকগত রাজচন্দ্র চৌধুরীর চতুর্থ বার্ষিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে তাঁর কোন কোন পুত্র ও কন্যা কলিকাতা হইতে সেখানে গমন করেন। শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত উপাসনা করেন এবং মিসেস্ হেমন্তকুমারী চৌধুরী প্রার্থনা করেন।

ছাত্রছাত্রীদের কৃতিত্ব—বিগত এম এ পরীক্ষাতে দর্শন শাস্ত্রে বীণাপাণি চক্রবর্ত্তী (১ম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া) ও ভূপেন্দ্রমোহন মিত্র (দ্বিতীয় বিভাগে), ইংরেজি সাহিত্যের বি শাখায় বীণাপাণি রায় (দ্বিতীয় বিভাগে—একমাত্র স্থান অধিকার করিয়া), অর্থনীতি শাস্ত্রের পুরাতন পাঠ্যের বি শাখায় মানসী চৌধুরী (তৃতীয় বিভাগে) এবং এম্ এস্ সি পরীক্ষাতে রসায়ন শাস্ত্রে মনোমোহন মজুমদার (দ্বিতীয় বিভাগে) উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

আবেদন।

প্রায় ৭৯ বৎসর গত হইতে চলিল কলিকাতার উপকণ্ঠে আচার্য্য বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্যোগে বেহালা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। এতাবৎকাল এই মন্দিরে নিয়মিত ভাবে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা চলিয়া আসিতেছে। সাম্বৎসরিক উৎসবে ব্রাহ্ম সমাজের শাখাত্রয় ও ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ও মুসলমান সকলে মিলিত হইয়া উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে এই মন্দিরের ছাদের অবস্থা এইরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে, ছাদটি ভাঙ্গিয়া নূতন না করিলে সমগ্র মন্দিরটি অচিরে ভূমিসাৎ হইবার সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সংস্কারে আনুমানিক ৮০০৲ টাকা খরচ পড়িবে। ধর্ম্মানুরাগী সাধু সজ্জনগণের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে সাহায্য দানে মন্দিরটি রক্ষা করুন। সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বেহালা ব্রাহ্মসমাজের প্রাণস্বরূপ আচার্য্য চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে আমরা সাধারণের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি। যিনি যাহা সাহায্য করিবেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে সানন্দে গৃহীত হইবে।

শ্রীভূধর চন্দ্র মতিলাল
শ্রীদেবীদাস মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক,
বেহালা ব্রাহ্মসমাজ, ২৪ পরগণা।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ কর্ত্তৃক ৫ই কার্ত্তিক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ

Registered No. C 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৫ ভাগ
১৫শ সংখ্যা।

১লা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ১৮৫৪ শক,
ব্রাহ্মসংবৎ ১০৩
17th November, 1932.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে জ্ঞানস্বরূপ জীবনবিধাতা, আমরা যত ক্ষুদ্র ও নগণ্যই হই না কেন, তুমি আমাদিগকে তোমার অনুরূপ করিয়াই, তোমার জ্ঞানে মণ্ডিত করিয়াই গড়িয়াছ, এবং জ্ঞান বিচার চিন্তার দ্বারা সত্য ও কল্যাণ নির্ণয় করিয়া তোমাকে জানিবার ও অনুসরণ করিবার উচ্চ অধিকার প্রদান করিয়াছ—পশু পক্ষীদের ন্যায় শুধু আহারে বিহারে জীবন ক্ষয় করিতে সৃষ্টি কর নাই। পরিতাপের বিষয়, আমরা অনেক সময়ই তাহা ভুলিয়া শুধু শারীরিক জীবন যাপন করি, অথবা সত্যাসত্য কল্যাণাকল্যাণ নির্ণয় করিবার জন্য কোনও চেষ্টা যত্ন না করিয়া, চিন্তাবিহীন ভাবে অপরের অনুকরণ করিয়া চলি, এবং দুর্গতি প্রাপ্ত হই। তুমি কৃপা করিয়া, নিত্য পথপ্রদর্শকরূপে সঙ্গে সঙ্গে আছ বলিয়াই, আমরা চিরদিন এই ভাবে চলিতে পারি না,—মাঝে মাঝে আমাদের চৈতন্যোদয় হয়। কিন্তু হে অন্তরদর্শী দেবতা, তুমি জান আমরা সহজে এই জড়তার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারি না, বিশেষতঃ নানা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া, অনেক সময় আমরা প্রকৃত পথনির্ণয়ে অসমর্থ হই, ভুল ভ্রান্তিতে পতিত হই। তথাপি তুমি যে আমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ কর না, সকল ভুল ভ্রান্তি আলস্য জড়তা দূর করিয়া কল্যাণের পথে লইয়া যাইতে সর্ব্বদা অন্তরে বাহিরে নিযুক্ত রহিয়াছ,—ইহাই আমাদের একমাত্র আশা। হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে আমাদের উচ্চ অধিকার হৃদয়ঙ্গম করিতে, এবং স্বাধীন ভাবে তোমার কল্যাণের পথ নির্ণয় করিয়া তাহা অনুসরণ করিতে সমর্থ কর। আমরা যেন আর এ ভাবে জীবন ক্ষয় না করি। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সম্পাদকীয়।

স্বাধীন চিন্তা—চিন্তা ও বিচার করিয়া আপনার কর্ত্তব্য ও গন্তব্যপথ নির্ণয়ের ক্ষমতা, একমাত্র মানুষের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বিধাতাপ্রদত্ত একটি অতি মূল্যবান উচ্চ অধিকার। এই বিশেষত্বই তাহার শ্রেষ্ঠত্বের এবং সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও কল্যাণের মূল। ইহা না থাকিলে তাহাকে চিরকাল এক প্রকার পশু-জীবনই যাপন করিতে হইত। যদিও তাহাকে অনেক সময় ইচ্ছাপূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ বিষয়ে চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিতে হয়, তথাপি মানুষ ইচ্ছা করিয়াও ইহাকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করিতে পারে না—ইচ্ছা থাকুক আর না থাকুক নানা চিন্তাধারা তাহার চিত্তে অবিরাম প্রবাহিত হইবেই হইবে। বাহিরের কোনও শক্তি যে তাহার চিন্তাপ্রবাহকে রুদ্ধ করিতে পারে না, তাহা ত সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রবল শক্তিশালী মানুষ অপরের ইচ্ছামত কার্য্য করিবার স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করিতে পারে, বাহিরের কার্য্য বন্ধও করিয়া দিতে পারে; কিন্তু কাহারও অন্তরের চিন্তা-স্রোতকে রুদ্ধ করিবার তাহার কোনও ক্ষমতা নাই। ইহা দেখিয়া সহজেই মনে হইতে পারে যে, প্রত্যেক মানুষই, কার্য্য বিষয়ে না হইলেও, অন্ততঃ চিন্তা বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক মানুষের চিন্তা বিষয়ে যথার্থ স্বাধীনতা কতটা আছে, তাহা একটু সূক্ষ্ম ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

অপরে চিন্তাপ্রবাহকে সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করিতে না পারিলেও যদি ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, কাহারও চিন্তাধারাকে একটা বিশেষ পথেই প্রবাহিত করিতে সমর্থ হয়, কিছুতেই অন্য কোনও দিকে প্রবাহিত হইতে না দেয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে, সে-ক্ষেত্রে চিন্তার প্রকৃত স্বাধীনতা নাই।

নিজের চিন্তাধারাকেও কেহ ইচ্ছা-বলে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিতে পারে না। কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না বলিয়াই যদি স্বাধীনতা আছে বলা যায়, তাহা হইলে এই অর্থে চিন্তার স্বাধীনতা একটা কথার কথা মাত্র হইয়া পড়ে। চিন্তার ধারাকে সকল বিষয়ের সকল দিকে অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হইতে দিয়া, সংস্কারবিমুক্ত বিশুদ্ধ যুক্তি বিচার দ্বারা প্রকৃত সত্য ও কল্যাণ নির্ণয়ের যে অধিকার, তাহা ছাড়া অপর কিছুই চিন্তার স্বাধীনতা বলিতে যথার্থতঃ বুঝায় না। যেখানে শুধু বাহিরের কোনও শক্তি নয়, অন্তরের কোনও সংস্কারও চিন্তার গতিকে কোনও সংকীর্ণ পথে বা প্রণালীতে আবদ্ধ রাখে, চারিদিকে প্রবাহিত হইতে দেয় না, সকল দিক বিচার করিয়া সত্য ও কল্যাণ নির্ণয়ে বাধা প্রদান করে, মোহাচ্ছন্ন করিয়া বিভ্রান্ত করে, সেখানেই চিন্তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইল, কোনও ক্রমেই আর স্বাধীন চিন্তা রহিল না, বলিতে হইবে। এরূপ স্বাধীন চিন্তা যে অনেকের মধ্যেই নাই, তাহা স্পষ্টই সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

আজ কাল সকলেই সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতার জন্য লালায়িত। স্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তার কথা প্রায় সকলের মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয় জন প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন চিন্তার পথ অনুসরণ করিয়া চলেন, সে কথা বলা বড় কঠিন। অনেকে মনে করেন, পূর্ব্ববর্ত্তিগণের পথ পরিত্যাগ করিয়া একটা নূতন পথে চলিলেই, একটা বিরোধী মত গ্রহণ করিলেই, স্বাধীন চিন্তার পথ অনুসরণ করা হইল। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক স্থলে তাহার মূলে বিন্দুমাত্রও স্বাধীন চিন্তা না থাকিয়া, শুধু নূতনের চিন্তা-বিহীন অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণই আছে। স্বাধীন চিন্তার ফলে বিশেষ কোনও পুরাতন মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতা জাগিতে পারে, দীর্ঘকালাচরিত পুরাতন পথ পরিত্যক্ত ও নূতন পথ অবলম্বিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া পুরাতনের ত্যাগ ও নূতনের অবলম্বনই স্বাধীন চিন্তার পরিচায়ক নহে। সম্পূর্ণ চিন্তাবিহীন হইয়া, বিনা বিচারে, অপরের অনুসরণের ফলেও এরূপ করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। অথবা, শুধু একটা নূতন কিছু করিবার, কিংবা বিদ্রোহী বলিয়া যশস্বী হইবার, আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত হইয়াও যে এরূপ করা না যায়, তাহাও নহে। পরন্তু, যাহা চিরন্তন সত্য ও কল্যাণ, তাহাকে কোনও চিন্তা যুক্তি বিচারই অসত্য ও অকল্যাণ বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে না। এই হেতু, শুধু পুরাতন বলিয়াই কিছু পরিত্যক্ত হইতে পারে না। যদি কোনও বিষয় যুক্তি বিচার চিন্তা ও পরীক্ষা দ্বারা সত্য ও কল্যাণকর বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে যত পুরাতনই হউক না কেন, তাহাকে নিশ্চয়ই অবলম্বন করিতে হইবে, কিছুতেই পরিত্যাগ করা উচিত হইবে না।

স্বাধীন চিন্তা যুক্তি বিচার পরীক্ষাই যে সত্য ও কল্যাণ নির্ণয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই ভাবে প্রত্যেকে যাহা সত্য ও কল্যাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবে, একমাত্র তাহা অনুসরণ করিতে যে সে বাধ্য, সে-কথাও স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু এই ভাবে যে-কেহ যে-কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে তাহাই যে সর্ব্বাবস্থায় ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইবে, ইহার মধ্যে মিথ্যা ও অকল্যাণকে সত্য ও কল্যাণ বলিয়া ভুল করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, এমন কথাও কিছুতেই বলা যায় না। বরং, মানুষ যে অনেক সময়ই এরূপ ভুল করে, তাহার বহু প্রমাণ আমরা সর্ব্বদাই চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি। এ বিষয়ে তাহাদের নিজেদেরও অনেক সাক্ষ্য রহিয়াছে। অনেকেই পরে নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ও সংশোধন করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই যথার্থতঃ সত্যান্বেষী ও কল্যাণকামী ব্যক্তি, এবং স্বাধীন চিন্তা, বিশুদ্ধ যুক্তিবিচার ও পরীক্ষার ফলেই, কালে নিজেদের ভ্রম বুঝিতে, প্রকৃত সত্য ও কল্যাণ নির্ণয় করিতে, সমর্থ হইয়াছেন। এই ক্ষেত্রেও স্বীকার করিতে হইবে, ইঁহার পূর্ব্বে তাঁহারা ভ্রান্তিবশতঃ যাহা সত্য ও কল্যাণ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা অনুসরণ করিয়া কিছুমাত্র অন্যায় করেন নাই,—সেরূপ করিতেই তাঁহারা বাধ্য ছিলেন। কিন্তু তথাপি ইহা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, অপরের সিদ্ধান্তের ন্যায় নিজের সিদ্ধান্তকেও সকল সংস্কারবিমুক্ত স্বাধীন চিন্তা ও বিশুদ্ধ যুক্তি বিচার পরীক্ষার দ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব হইতে মানুষ কোনও অবস্থায়ই মুক্ত নহে; বরং, যেখানে দীর্ঘকাল-সমাচরিত ও বহুজন-সেবিত পুরাতন সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া সে কোনও নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, সেখানে তাহাকে অতি সূক্ষ্মভাবে ও বিশেষ সাবধানতার সহিত বার বার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, কোথাও কোনও প্রকার বিন্দু পরিমাণ ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে কি না—কোনও কিছু গূঢ় সংস্কার বা ঝোঁক স্বাধীন চিন্তা ও বিশুদ্ধ বিচার পরীক্ষাকে অজ্ঞাতসারে ক্ষুণ্ণ করিতেছে কি না। এরূপ করিলে যে কোনও ভুল ভ্রান্তিই বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে না, এবং প্রত্যেকেই যথাসময়ে বিশুদ্ধ সত্যে ও কল্যাণে উপনীত হইতে সমর্থ হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রকৃত স্বাধীন চিন্তা হইতে সত্য ও কল্যাণের কোনও প্রকার ভয়েরই কারণ নাই। সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র স্বার্থ, মলিন উদ্দেশ্য ও ভ্রান্ত সংস্কারের মোহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, প্রকৃত সত্য ও কল্যাণ নির্ণয় করাই স্বাধীন চিন্তার একমাত্র লক্ষ্য, নিরপেক্ষ যুক্তি বিচার পরীক্ষাই তাহার একমাত্র উপায়, অবিরাম অনুসন্ধানই তাহার প্রাণ। সুতরাং খাঁটি সত্য ও কল্যাণ ব্যতীত অপর কিছু লইয়াই তাহার তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকার সম্ভাবনা নাই। তাহার হৃদয়-দ্বার সর্ব্বদা সকল দিক হইতে আলোক পাইবার জন্য উন্মুক্ত, চিত্ত নূতন সত্য ও তত্ত্ব গ্রহণের জন্য সদা প্রস্তুত। অপর দিকে, সত্য ও কল্যাণ নিত্য, এবং সকল মানুষের পক্ষেই এক ও অভিন্ন। সোজা বা আঁকা বাঁকা যে পথেই চলুক না কেন, স্বাধীন চিন্তা মানুষকে পরিণামে এক স্থানেই উপস্থিত করিবে। আংশিক দর্শনের মধ্যে কিছু পার্থক্য

থাকিলেও পূর্ণ দর্শন ও জ্ঞানের মধ্যে কোনও পার্থক্যই থাকিতে পারে না। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, সকল দেশের ও কালের লোকের মধ্যে প্রকৃত সত্য ও কল্যাণ বিষয়ে অপূর্ব্ব মিল আছে, মূলতঃ কোনও পার্থক্যই নাই। এ পর্য্যন্ত কেহ কোনও দেশে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তি বিচার পরীক্ষার বলে প্রকৃত সত্য ও কল্যাণকে মিথ্যা ও অকল্যাণ, এবং মিথ্যা ও অকল্যাণকে সত্য ও কল্যাণ বলিয়া, প্রমাণ করিতে পারে নাই,—কোনও দিন পারিবেও না। যদি কোথাও কেহ সত্য ও কল্যাণের বিরোধী কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে, সেখানে প্রকৃত স্বাধীন চিন্তা নাই, কোনও ভ্রান্ত সংস্কার বা ঝোঁক নিশ্চয়ই সেই চিন্তাধারাকে বিপথগামী করিয়াছে। এই হেতু শাশ্বত সত্য ও কল্যাণই, কোথাও প্রকৃত স্বাধীন চিন্তা আছে কি না, তাহা নির্ণয় করিবার একমাত্র মাপকাঠি। যদি স্বাধীন চিন্তা, জ্ঞানের মূল প্রস্রবণ সত্যস্বরূপ কল্যাণস্বরূপ জীবনবিধাতাকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করে, তবে বুঝিতে হইবে সেখানে নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ স্বাধীন চিন্তা নাই, কোনও প্রচ্ছন্ন ভ্রান্তি তাহাকে বিপথগামী করিয়াছে। অন্য দিকে, একের সত্যে আর অপরের সত্যেও কোনও বিরোধ নাই। সেরূপ কোনও বিরোধ দৃষ্ট হইলে, বুঝিতে হইবে কোথাও কোনও গোলযোগ আছে, সুতরাং আরও সতর্কতার সহিত সমস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। যত বিরোধ ও পার্থক্য দেখা যায়, তৎসমস্তই তাহার সঙ্গে জড়িত কতকগুলি অবান্তরবিষয়ক মিথ্যা ও অকল্যাণকর আবরণ লইয়া। এই আবরণগুলি সত্য ও কল্যাণকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাদের প্রকৃত রূপ কিছুতেই আর নয়নগোচর হয় না। সুতরাং স্বাধীন চিন্তা হইতে একমাত্র এই মিথ্যা অকল্যাণকর আবরণগুলিরই ভয়ের কারণ আছে। স্বাধীন চিন্তার বলে এই গুলিকে শতধা ছিন্ন ও সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিয়া, বিশুদ্ধ সত্য ও কল্যাণকে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করা যে প্রত্যেকের পক্ষেই একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা আর অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

এই অতি কল্যাণকর স্বাধীন চিন্তার পথে কি গুরুতর বাধা রহিয়াছে, তাহা একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। আজকাল "দাস-মনোভাব" কথাটা সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা যে স্বাধীন চিন্তার পথে সর্ব্ব প্রধান ও অতি গুরুতর বাধা, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কথাটার প্রকৃত মর্ম্ম অতি অল্প লোকেই সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে পারিয়াছেন মনে হয়। কেননা যাহাদের মুখে এই কথাটা সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের অধিকাংশই যে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, তাহা সুস্পষ্টই পরিলক্ষিত হইতেছে। যাহারা অতি তারস্বরে ইহার নিন্দা করে, এবং অপরের উপর সর্ব্বদা ইহার আরোপ করে, তাহাদের মধ্যেই অনেক সময় ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল আকারে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তাহারা অপর কাহাকেও স্বাধীন চিন্তার অধিকার দিতে মোটেই প্রস্তুত নহে, তাহাদের বিচারে যে-কেহ তাহাদের মত ও পথ অনুসরণ করা সঙ্গত মনে না করে, সে-ই দাসমনোভাববিশিষ্ট। ইহাদের বিচারে ইংরেজী শিক্ষাই দাসমনোভাবের জনক, এবং ইংরেজবিদ্বেষ ও দেশীয় যাহা কিছু সমস্তকেই নির্ব্বিচারে সুন্দর ও কল্যাণকর মনে করিয়া গ্রহণ ও অনুসরণ করাই, তদভাবের একমাত্র পরিচায়ক। ইহার কোনটীর মধ্যেই যে প্রকৃত স্বাধীন চিন্তা ও বিচারের কোনও লক্ষণই নাই, এবং মূলে কোনও সত্য ভিত্তি নাই, তাহা সামান্য একটু পরীক্ষা করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পূর্ব্ববর্ত্তী বহু শতাব্দীর অবস্থার সহিত পরবর্ত্তী অবস্থার তুলনা করিয়া বিচার করিলে কি কাহারও মনে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ থাকিতে পারে যে, কোনও দেশীয় শিক্ষায় নয়, একমাত্র ইংরেজী শিক্ষার ফলেই আমাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার ভাব ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে? বর্ত্তমান কালেও কি ইংরেজী শিক্ষার প্রভাববিরহিত, শুধু দেশীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, কোনও পণ্ডিতাগ্রণ্যের মধ্যে সে ভাব দেখিতে পাওয়া যায়? অপর দিকে, যাহা কিছু দেশীয় সমস্তই সুন্দর ও কল্যাণকর, সর্ব্বথা গ্রহণযোগ্য, আর যাহা কিছু বিদেশীয় সবই কুৎসিত ও অকল্যাণকর, সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জনীয়, নিরপেক্ষ বিচারদ্বারা কেহ কি এই কথা প্রমাণ করিতে পারে? ইহা যে কোনও ক্রমেই সম্ভবপর নয়, উক্ত মত যে কোনও প্রকার স্বাধীন চিন্তা ও সত্য ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা চিন্তাশীল সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে।

শুধু তাহাই নহে, এদেশের অদূরকালবর্ত্তী শাস্ত্র ও সংহিতাকারগণ যে স্বাধীন চিন্তার পথকে বিধিমত ইচ্ছাপূর্ব্বক রুদ্ধ করিয়াছেন, দাসমনোভাবকে সকলের মধ্যে সর্ব্বপ্রযত্নে রোপিত ও বর্দ্ধিত করিয়াছেন, তাহা কি অস্বীকার করিবার কোনও উপায় আছে? এই দাসমনোভাব হিন্দু সমাজস্থ লোকের চিত্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কিরূপ গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়াছে ও সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, এক দিকে সমাজের শীর্ষস্থানীয় শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতমণ্ডলী ও অপর দিকে বিশেষ ভাবে সর্ব্ব প্রকারে লাঞ্ছিত নিগৃহীত পদদলিত নিম্নতম শ্রেণীসকলের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, এ ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তার বীজ উপ্ত ও অঙ্কুরিত করা কি প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা নিজেই আপনাদের চরম দুর্গতির অবস্থাকে এমন স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইতে শিখিয়াছে যে, তাহারা কিছুতেই ধারণা করিতে পারে না, অন্যের সমান অধিকার লাভে, উচ্চতর স্তরে উন্নীত হওয়া বিষয়ে, তাহাদের কোনও ন্যায্য দাবী আছে, অথবা তাহা তাহাদের পক্ষে কোনও রূপে কল্যাণকর হইতে পারে। অনেক স্থলে তাহারা নিজেই এরূপ উন্নতিসাধনের বিরোধী, ইহাকে ধর্ম্মবিরুদ্ধ পাপজনক ও অকল্যাণকর মনে করে। একজন হয়ত স্বার্থান্ধতা বশতঃই, অপরে কিন্তু সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবেই, অথবা

স্বার্থবিরোধী জানিয়াও, এমনই বদ্ধমূল সংস্কারের দাস হইয়া পড়িয়াছে যে, কিছুতেই তাহারা তাহাদের চিন্তাধারাকে সেই আবাল্য-বর্দ্ধিত অন্ধ সংস্কারের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া স্বাধীন ভাবে কল্যাণের পথে প্রবাহিত করিতে পারে না। এই বদ্ধমূল দাসমনোভাব দূর করিয়া স্বাধীন চিন্তার ধারা প্রবাহিত করা কি প্রকার দুঃসাধ্য, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অথচ তাহা ব্যতীত প্রকৃত উন্নতি ও কল্যাণ লাভের যখন অন্য কোনও উপায় নাই, তখন এই অবস্থা দূর করিয়া তদুপযোগী অবস্থা আনয়ন করিবার জন্য প্রত্যেককেই যে সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

আলস্য, উদাসীনতা, নূতনের মোহ, ভ্রান্ত স্বদেশপ্রীতি, অমূলক বিজাতিবিদ্বেষ, অপাত্রে অর্পিত শ্রদ্ধা ভক্তি, উপযুক্ত পাত্রে ও অতীন্দ্রিয় বিষয়ে শ্রদ্ধা ভক্তির অভাব, সঙ্গীদিগের বিদ্রূপ ও বিরাগভীতি, অভ্যাস শিক্ষা ও প্রকৃতিগত সংস্কার প্রভৃতি নানা কারণে আমাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার অভাব ঘটিতে পারে। বিস্তৃত ভাবে সকল বাধা উল্লেখ ও আলোচনা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আমাদের সকলেরই যে এবিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, তাহাই প্রধান কথা। আমরা যেন কখনও এই গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব ভুলিয়া না চলি। আমরা শাশ্বত সত্য ও কল্যাণে যদি না পৌছিয়া থাকি, সত্য ও কল্যাণের মূল প্রস্রবণ জ্ঞানদাতা জীবনবিধাতাকে যদি চিনিতে না পারিয়া থাকি, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে সম্যক্ প্রকারে স্বাধীন চিন্তার পথ অবলম্বিত হয় নাই; তদ্বিরোধী কোনও সিদ্ধান্তে যদি উপনীত হইয়া থাকি, তবে নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিতে হইবে নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হইয়াছে, সর্ব্বসংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তার ধারাতে কোনও বিঘ্ন ঘটিয়াছে, আরও সাবধানতার সহিত সমস্ত বিচার ও পরীক্ষা করা অনিবার্য্যরূপেই আবশ্যক। আমাদিগকে সর্ব্বদা এ কথা স্মরণে রাখিয়াই কার্য্য করিতে হইবে। করুণাময় জীবন-দেবতা আমাদিগকে সে বুদ্ধি ও শক্তি প্রদান করুন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক।

ব্রাহ্মসমাজের কাজ

সমবিশ্বাসী ভ্রাতা ভগিনীগণ,

এটা সত্য কথা যে, বৃহত্তর কোনও কোনও সভার সভাপতি রূপে আমি কাজ করেছি। কিন্তু তাতে আমার ততটা সঙ্কোচ হয় নাই, যতটা সঙ্কোচ আজকের এ সভায় হচ্ছে। তার কারণ এ নয় যে, আপনাদিগকে আমি আত্মীয় মনে করি না। কারণ এই যে, যদিও আমি যৌবনকাল হইতেই ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত, তবু আমি বিশেষ ভাবে ধর্ম্ম সাধন করি নি। ধর্ম্ম-সাধনের সুযোগ পাই নি, তা নয়; যে কারণেই হউক, ধর্ম্ম-সাধনই জীবনের প্রধান কাজ, এ ভাবে আমি সাধন কর্‌তে পারি নি। অবশ্য, সব কাজই যাতে ধর্ম্মানুগত হ'য়ে কর্‌তে পারি, তার চেষ্টা আমি করি। কিন্তু একটা ধর্ম্মসম্মিলনে সভাপতির কাজ কর্‌বার যোগ্যতা আমার আছে ব'লে আমি মনে করি না। যা হউক, অযোগ্য হ'লেও, এই কর্ত্তব্য আমি গ্রহণ করেছি। একটু প্রলোভনও ছিল। তা এই যে, আমি আশা করেছি এখানে আমি আপনাদের সকলের একটু স্নেহ-প্রীতি পাব। সেই ভরসায় এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমার যে-কিছু দোষ ত্রুটী হবে, তার জন্য এক দিকে যেমন ভগবানের চরণে ক্ষমা চাচ্ছি, তেমনি অপর দিকে আপনাদের কাছেও প্রার্থনা কর্‌চি যে, আপনারা আমার ত্রুটী অপরাধ ক্ষমা কর্‌বেন।

দুঃখের বিষয়, আমি আমার বক্তব্য লিখে আন্‌তে পারি নি। আমি দেখেছি, কোন বক্তব্য বিষয়, সময় থাক্‌লে গুছিয়ে সংক্ষেপে লিখ্‌তে পারি; কিন্তু লিখ্‌বার সময় না পেলে, আর মৌখিক বল্‌তে হ'লে, দীর্ঘ হ'য়ে যায়। আমার এই বক্তৃতা এই কারণে কিছু দীর্ঘ হ'লে, আপনারা তা ক্ষমা কর্‌বেন।

মানুষ সংস্কারক।

মানুষের একটি প্রধান লক্ষণ, মানুষ সংস্কারক। প্রতি দিনই মানুষের শরীর মলিন হচ্চে, এবং মানুষ তার সংস্কার কর্‌চে। প্রতি দিনই দেহের ক্ষয় হচ্চে, তা ছাড়া রোগ হ'লেও শরীরের অনেক ক্ষয় হয়। আবার মানুষ তার সংস্কার করে।

মানুষের বাসগৃহও সর্ব্বদা মলিন হচ্চে এবং কালে জীর্ণ হ'য়ে যাচ্চে। মানুষ তার সংস্কার করে। তেমনি মানুষের সমাজও সর্ব্বদা এক ভাবে থাক্‌তে পারে না, তাতে দোষ ত্রুটী উপস্থিত হয়। তাকে যদি ঠিক রাখ্‌তে হয়, তবে সংস্কার আবশ্যক। রাষ্ট্রীয় বিষয়েও যখন যে দোষ ত্রুটী দেখা যায়, তার সংস্কার কর্‌তে হয়। মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল প্রকার জীবনেই এইরূপে সংস্কারের আবশ্যক হয়। সংস্কার ভিন্ন মানুষের জীবনের কোনও দিকই ঠিক থাকে না—উন্নতি ত দূরের কথা।

সকল বিভাগে সংস্কার প্রয়োজন।

সকল বিষয়েই সংস্কার আবশ্যক। মানব জীবনের সকল বিভাগ পরস্পরের সহিত জড়িত। এ জন্য সকল প্রকার সংস্কার পরস্পরসাপেক্ষ। রাজা রামমোহন রায় ইহা বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। তাই তিনি জাতীয় জীবনের প্রধান প্রধান সকল দিকেই সংস্কার আরম্ভ করেছিলেন। এই যে বর্ত্তমানে অস্পৃশ্যতা নিবারণের আন্দোলন চল্‌চে, তা রাজনীতির সংস্রবে হচ্চে। ব্রাহ্মগণ এই চেষ্টা পূর্ব্ব হইতেই কর্‌চেন; কিন্তু অন্য দিক থেকে। বর্ত্তমানে দেখা যাচ্চে দেশের সকল লোককে একটা বড় প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত কর্‌তে হ'লে, কতক লোকের প্রতি যে অবিচার অনেক কাল থেকে হচ্চে, তা দূর না কর্‌লে চল্‌চে না। সমাজের ভিতরকার এই অবিচার দূর কর্‌বার জন্য কেউ কেউ এরূপ আইনও প্রস্তাব কর্‌চেন যাতে সর্ব্ব

কুমিল্লা নগরীতে, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩২ তারিখে, পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্ম সম্মিলনীর চাচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনে, সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম এ, প্রদত্ত অভিভাষণের চুম্বক

সাধারণের অর্থে প্রস্তুত রাস্তা, বিদ্যালয়, কূপ প্রভৃতিতে সকল জাতির সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। তবেই দেখুন, রাজনীতির সংস্কারের জন্য যেমন সমাজসংস্কারের প্রয়োজন হচ্ছে, তেমনি সমাজ সংস্কারের জন্যও আইনের প্রয়োজন হচ্ছে। পূর্ব্বেও সমাজসংস্কারের জন্য রাজকীয় শক্তির সাহায্য আবশ্যক হ'ত। এই কারণেই রামমোহন রায় সকল বিভাগের সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন।

সকল সংস্কারাকাঙ্ক্ষার মূল উৎস ধর্ম্মবিশ্বাস।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বল্লেও রামমোহন রায়ের সংস্কারক হবার কারণ, এবং সংস্কারকার্য্যে অটল অধ্যবসায়ের কারণ বুঝ্‌তে পারা যায় না। তাঁর সকল প্রকার সংস্কারাকাঙ্ক্ষার মূল উৎস কোথায়? ধর্ম্মের ক্ষেত্রে সংস্কার কর্‌তে গিয়ে অনেককে অশেষ কষ্ট স্বীকার কর্‌তে হয়েছে, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়েছে। সমাজ-সংস্কার বা রাজনীতি-সংস্কার কর্‌তে গিয়েও অনেককে জীবনপাত কর্‌তে হয়েছে। তাঁরা এমন দৃঢ় হ'তে পেরেছেন কি ক'রে? এই জন্য পেরেছেন যে, তাঁরা বিশ্বাস কর্‌তেন, 'আমি যা কর্‌চি তা ন্যায় ও কল্যাণকর, এই বিশ্বের নিয়ন্তা একজন আছেন, তিনি সত্য, মঙ্গল ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার সাহায্য কর্‌চেন। মঙ্গল যা, তা প্রতিষ্ঠিত হবেই হবে; শুভের প্রতিষ্ঠা, সত্যের প্রতিষ্ঠা, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হবেই হবে।' এই বিশ্বাস না থাক্‌লে কেউ আপন কর্ত্তব্যের পথে প্রাণ পণ কর্‌তে পারে না। রামমোহন রায়ের এই বিশ্বাস ছিল। ধর্ম্মবিশ্বাসই তাঁর সকল প্রকার সংস্কারের মূল উৎস ছিল।

ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারের দিকটাই সাধারণতঃ লোকের চক্ষে পড়ে; কিন্তু তার উৎস ধর্ম্মবিশ্বাস। এই ধর্ম্মবিশ্বাসকে সাধনের দ্বারা প্রবল কর্‌তে হবে। তবেই আমরা সকল প্রকার সংস্কার কার্য্যে সফলতা লাভ কর্‌তে পার্‌ব।

এই কথায় আমি এমন বল্‌চি না যে, কেবল সংস্কারের জন্যই ধর্ম্মের প্রয়োজন, ধর্ম্মের অন্য প্রয়োজন নাই। অনেকে সংস্কারের দিকটাই দেখেন; তাই আমি সংস্কারের কথা নিয়ে আরম্ভ করেছি। কেউ কেউ বলেন, ব্রাহ্মসমাজের কাজ যা ছিল, তা হ'য়ে গেছে। তাঁরা কেবল সংস্কারের কথাই ভাবেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ যে-সব সংস্কার আরম্ভ করেছেন, প্রাচীনতর সমাজসকল এখনও তা ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করেন নাই। বিবাহ বিষয়ে জাতিভেদলোপ ত অতি সামান্যই গৃহীত হ'য়েছে। কিন্তু সমাজসংস্কার হ'য়ে গেলেও ধর্ম্মের অন্য প্রয়োজন যথেষ্ট থাক্‌বে। আর, সংস্কারের কাজটাও ভাল ক'রে কর্‌তে হ'লে ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রয়োজন।

সম্প্রতি যাঁর উপবাসের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীতে এতটা আলোড়ন হ'ল, তাঁরও সকল প্রকার সংস্কার-চেষ্টার মূলে ধর্ম্ম-বিশ্বাস। সংস্কারকার্য্যে মহাত্মা গান্ধীর যে অতুলনীয় প্রভাব, ধর্ম্ম-বিশ্বাসই তার মূল কারণ। অতএব এটা আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আমরা সংস্কারকার্য্যেও সফল হ'তে পার্‌ব না, যদি ধর্ম্মেতে প্রতিষ্ঠিত না হ'তে পারি।

উন্নত ধর্ম্মের লক্ষণ।

ধর্ম্ম বিষয়ে কিছু বল্‌তে হ'লে, আমাকে সঙ্কোচের সহিত বল্‌তে হবে। আমার অন্তরের অনুভূতির ফল বলে' আমি বেশী কিছু বল্‌তে পার্‌ব না। আমার জীবনের প্রধান কাজ ধর্ম্মবিষয়ক নয়; সুতরাং আমার এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বল্‌বার অধিকার নাই। তবে সাধারণ বুদ্ধিতে এবং অনুমানে যা পাই, প্রধানতঃ তাই বল্‌ব। আমার দোষ ত্রুটী হবে, আপনারা তা ক্ষমা কর্‌বেন।

নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে দেখা যায় যে, ভয় দেখিয়ে লোককে সৎপথে রাখ্‌বার চেষ্টা করা হয়। নৈতিক নিয়ম পালন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। প্রকৃত ধর্ম্মের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ সুনীতি। কিন্তু সেটিকে ভয়ের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার চেষ্টা করা উন্নত ধর্ম্মের লক্ষণ নয়। 'তুমি যদি এই এই মন্দ কাজ কর, পরলোকে এই এই শাস্তি পাবে'—এই ভাবে নীতির প্রতিষ্ঠা ঠিক্ হয় না।

আবার অনেক সময় লোভ দেখিয়েও সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত কর্‌বার চেষ্টা করা হয়। 'এই এই ভাল কাজ কর্‌লে পরলোকে এই এই পুরস্কার পাবে'—এইরূপে লোভে পড়ে' যে সৎকার্য্য করা যায়, তা-ও যথার্থ ধর্ম্ম নয়; তা বাণিজ্য। আমরা এ-রকম ধর্ম্মের পক্ষপাতী নই।

প্রার্থনা ও গুণানুবাদ।

প্রার্থনা খুব উৎকৃষ্ট জিনিষের জন্যও হ'তে পারে, খুব নিকৃষ্ট জিনিষের জন্যও হ'তে পারে। আমরা দেখ্‌তে পাই, এক জাতি অন্য জাতিকে আক্রমণ কর্‌তে যাবার সময় প্রার্থনা করে, যেন যুদ্ধে জয়ী হয়। কোন অবস্থাতেই দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের সমর্থন করা যায় কি না, তার আলোচনা কর্‌ব না। কিন্তু যদি যুদ্ধের ন্যায্যতা ও প্রয়োজন স্থল-বিশেষে স্বীকার করা যায়, তা হ'লেও আত্ম-রক্ষা, স্বদেশ-রক্ষা বা দুর্ব্বলের রক্ষা ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করাকে সমর্থন করা যায় না। স্বার্থের জন্য যদি যুদ্ধ করা যায়, তা কখনও ধর্ম্ম-সঙ্গত নয়। সুতরাং এরূপ যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য যে প্রার্থনা, তা কখনও উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের অঙ্গ নয়। দস্যুরা যে ডাকাতি কর্‌তে যাবার পূর্ব্বে কালীপূজা করে, এও সেইরূপ।

স্বার্থপরতা, বিষয়াসক্তি, অহঙ্কার, কুপ্রবৃত্তি প্রভৃতি অন্তরের মন্দ ভাব দূর কর্‌বার জন্য যে প্রার্থনা, তা আবশ্যক, কিন্তু তাকেও ধর্ম্মজীবনের উচ্চতম অবস্থার লক্ষণ বলা যায় না। আমার মনে হয়, যখন মানুষ ভগবানের সান্নিধ্য সর্ব্বদা অনুভব করে, যখন তাঁর গুণানুবাদ স্বাভাবিক হয়, মানুষ তাঁর গুণানুবাদ না করে' থাক্‌তে পারে না, তা-ই উচ্চ অবস্থা। সে অবস্থায় দৈন্য থাকা সম্ভব নয়; ভিক্ষার ভাব থাকে না। তখন মানুষ কেবল বিস্ময় ও আনন্দে তাঁর স্তুতি করে, এবং তাঁর সহযোগী ও সহকর্ম্মী হ'য়ে সদনুষ্ঠানে রত থাকে। তখন মানুষ কেবল ভগবৎপ্রসঙ্গেই রস পায়; অপর কিছুতে রস পায় না। এই অবস্থাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা।

কিন্তু কেবল আনন্দের জন্যই যদি আমরা ভগবানকে চাই, তা হ'লেও হ'ল না। পূর্ব্বাচার্য্যগণ ধর্ম্মের পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় বলেছিলেন। বাস্তবিকই তা-ই। আমাদের

মত নিকৃষ্ট অবস্থার লোকদের এ পথে চল্‌তে বড়ই সাবধান হওয়া আবশ্যক।

পরমেশ্বরকে জান্‌লে, উপলব্ধি কর্‌লে, মানুষ তাঁকে প্রীতি ভক্তি না করে,' তাঁর অনুগত না হ'য়ে, থাকৃতে পারে না। সে অবস্থা হ'তে যদি কেউ কথা বলেন তা আমাদের ভাল লাগে। সকল লোকের ধর্ম্ম-কথা ভাল লাগে না! অবশ্য ক্ষুধা না থাক্‌লে কোনও খাদ্যই ভাল লাগে না। রোগ হ'লে কুখাদ্য অখাদ্যই ভাল লাগে। তবু যাঁরা যোগযুক্ত হ'য়ে কথা বলেন, তাঁদের কথা অবশ্যই ভাল লাগে।

যার যাকে ভাল লাগে, সে তার কথা সর্ব্বদাই বলে। ঋষিরা বলেছেন, 'তিনি পুত্রের চেয়ে প্রিয়, বিত্তের চেয়ে প্রিয়, অন্য সকল বস্তুর চেয়ে প্রিয়'। যারা অধার্ম্মিক তারা বুঝ্‌তে পারে না যে, তিনি পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়; কিন্তু এ অবস্থা যখন দাঁড়াবে, তখন যে-সব মানুষ আমাদের প্রিয়, তারা আরও প্রিয় হবে। পারিবারিক সম্বন্ধগুলি পবিত্র, তাই ভক্তেরা ভগবানের সঙ্গে এ-সব সম্বন্ধ স্থাপন করে' তাঁকে সম্বোধন করেছেন। বাস্তবিক পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধ আমরা যাতে ভাল করে' উপলব্ধি কর্‌তে পারি, এজন্যই পরমেশ্বর পিতা-পুত্র, ভাই-ভগ্নী, পতি-পত্নী প্রভৃতি সম্বন্ধ সৃজন করেছেন।

অনেকে বলেন, তোমরা ঈশ্বরকে এত খোসামোদ কর কেন? বাস্তবিক আমরা খোসামোদ করি না। আরাধনা স্বাভাবিক; ইহা না করে' থাকা যায় না। সাধক তাঁর গুণে মুগ্ধ হ'য়ে যান। সাধক যে ভগবানের গুণানুবাদ করেন, এটা তাঁর কাছ থেকে কোনও কাজ আদায়ের চেষ্টা নয়। আমাদের আরাধনাতে পরমেশ্বরের কোনও লাভ ক্ষতি হয় না; আমাদেরই উপকার হয়। সত্য বটে, উপাসনা আমরা সব সময় অনুভূতি থেকে করি না; কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতা যেমন স্বাভাবিক, উপাসনাও তেমনি স্বাভাবিক। কবি বাহিরের জগৎ বা অন্তরের ভাব দেখে যেমন কবিতা লেখেন, উপাসনাও তেমনি।

উপাসনা ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত।

উপাসনা দুই প্রকার—ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত। দুইটিই আবশ্যক। উপাসনার সঙ্গে জীবনের ব্যবহারের সামঞ্জস্য যাতে থাকে, সে দিকে আমাদের খুবই দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে। তা না হ'লে উপাসনা নিষ্ফল ও অনিষ্টকর হবে, লোকে আমাদের কপট মনে কর্‌বে এবং উপাসনার প্রতি তাদের অবজ্ঞা জন্মাবে। জীবনকে উপাসনার অনুযায়ী করে' গড়া কঠিন বটে, কিন্তু অসাধ্য নয়। অনেক সাধু লোকের জীবন উপাসনার ভাবে পূর্ণ দেখা গিয়েছে।

মহৎ বাক্যের উপলব্ধিহীন, অচিন্তিত আবৃত্তি সম্বন্ধে আমাদের খুব সাবধান হওয়া উচিত। সর্ব্বদা দেখা উচিত, আমরা কাজে যতটা কর্‌তে পারি বা করি, কথা বল্‌বার সময় তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছি কি না। এটা আমি কেবল ব্রাহ্মদের বল্‌চি না; সকলকেই বল্‌চি। এই সতর্কতা সকলেরই আবশ্যক। তবে ব্রাহ্মসমাজের লোকদের একটু বেশী সাবধান হওয়া উচিত। তার কারণ এই যে, আমরা মনে করি, সকল দেশের সকল শাস্ত্রে আমাদের অধিকার আছে। সব ধর্ম্মাবলম্বীরই এই অধিকার আছে; কিন্তু আমরা এটি বেশী ক'রে অনুভব করি। তার ফল এই হয়েছে যে, অনেক বড় বড় সত্য আমাদের পরিচিত হ'য়ে গেছে। সুতরাং এমন সব বড় বড় সত্যের কথা আমরা সহজে ব'লে ফেলি, যা সাধনদ্বারা আমরা জীবনে পরিণত কর্‌তে পারি নি।

জীবনকে ছাড়িয়ে কথা বলার জন্য বিদ্রূপ-বাণী সব ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকের প্রতিই প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু এটাও মনে রাখা উচিত যে, আদর্শ সর্ব্বদাই বড় থাক্‌বে। আদর্শ যত বড়, জীবন কখনও তত বড় হ'তে পারে না; কেন না, আদর্শ অপরিসীম। সুতরাং আদর্শে পৌঁছাতে পারিনি বলে' যে বিদ্রূপ, তাতে আমরা বিচলিত হই না। বিচলিত হই তখন, যখন আদর্শে পৌঁছাবার জন্য চেষ্টাও না থাকে। আদর্শে পৌঁছাতে না পারা ও আদর্শহীনতা এক কথা নয়। শতবার পতন হবে, তবু আদর্শকে ধরে' থাক্‌ব; কিন্তু আদর্শহীন জীবনকে পছন্দ কর্‌ব না।

নির্জ্জন সাধনও একান্তই আবশ্যক। এদেশে প্রাচীনকালে নির্জ্জন সাধন খুবই ছিল। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম থেকে খৃষ্টানরা কি গ্রহণ কর্‌তে পারেন, এই প্রশ্নের উত্তরে ইণ্টার্ণ্যাশনাল রিভিউ অব্ মিশন্স পত্রিকায় একজন ইংরেজ খৃষ্টীয় মিশনারী বলেছিলেন—ধ্যান। কিন্তু সম্মিলিত সাধনও এদেশে ছিল। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজ সম্মিলিত উপাসনা অবলম্বন করেছেন। আর্য্য সমাজেও সম্মিলিত উপাসনা কিছু কিছু আছে। ইহা খুব দরকার।

নির্জ্জন সাধনও প্রয়োজন। আমরা নিশীথে অনুভব করি যে, আমরা একা। তখন সহস্র লোকের করতালিও কোনও কাজে লাগে না। অন্তিম দিনেও ধনবল জনবল কিছুই কাজে লাগে না। কোনও বলই বল নয়; বল কেবল অন্তরের ধর্ম্ম-সম্বল।

স্বাধীন চিন্তা।

একাকিত্বের প্রধান সাধনা স্বাধীন চিন্তা। স্বাধীন চিন্তা ভিন্ন উন্নত ধর্ম্মের পথে চলা যায় না। কিন্তু স্বাধীন চিন্তার একটি বিপদ এই যে, অন্যের সকল কার্য্যেই দোষ ধর্‌বার ও প্রতিবাদ কর্‌বার প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। তা ছাড়া কেহ কেহ মনে করেন, সকলেই স্বাধীন ভাবে চিন্তা কর্‌লে একত্রে কাজ করা যায় না; স্বাধীন চিন্তায় ঐক্য নষ্ট হয়। এ কথাটা ঠিক নয়। Emerson এই মর্ম্মে বলেছেন—"There is one mind common to all." সকলের আত্মার মধ্যে ঐক্য আছে। এজন্য স্বাধীন ভাবে চিন্তা কর্‌লেও সকলে একই সত্যে পৌঁছাতে পারে।

মানুষের আত্মাই সত্যের সাক্ষী। সত্য এ জন্য মান্য নয় যে, অমুক লোক বলেছিলেন। সত্য এ জন্যই মান্য যে, আমার আত্মা তাকে আপনিই স্বীকার করে। সত্য তৎক্ষণ

আমার পক্ষে সত্য হয় না, যতক্ষণ আমার আত্মা তাতে সায় না দেয়।

আর, স্বাধীন চিন্তা থাকলে তাতে মানুষ ঠেকে শেখে। যদি সরল সত্যানুসন্ধান থাকে, তবে বার বার ভুল ক'রেও সত্যে উপনীত হওয়া যায়।

একেশ্বরবাদ।

এই স্বাধীন চিন্তার সাহায্যেই আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ উপস্থিত হয়েছিলেন—একেশ্বরবাদে। রামমোহন রায় স্বাধীন চিন্তার পথেই একেশ্বরবাদে পৌঁছেছিলেন। তিনি বেদান্তকে আশ্রয় ক'রে বহুদেবতাবাদের বিরুদ্ধে গেলেন। আবার স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তকে আশ্রয় ক'রেও বহুদেবতাবাদ রাখ্‌লেন। Sister নিবেদিতা লিখে গেছেন—রামমোহন রায়ের প্রধান তিনটি কথা—বেদান্ত স্বীকার, স্বদেশ-প্রেম প্রচার ও হিন্দু মুসলমানে সমান প্রীতি—বিবেকানন্দ অনুসরণ করেছিলেন। যথা—"It was here [Naini Tal] too that we heard a long talk on Rammohan Ray, in which he [Swami Vivekananda] pointed out three things as the dominant notes of this teacher's message, his acceptance of the Vedant, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Mussalman equally with the Hindu. In all these things he claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Rammohan Roy had mapped out."—P. 19, '*Notes of some Wanderings with the Swami Vivekananda*' by Sister Nivedita.

একেশ্বরবাদ জাতীয় একতার মূল।

আমার বিবেচনায় বহুদেবতাবাদ থাকলে জাতীয় একতা হ'তে পারে না। বহুদেবতাবাদ ও একেশ্বরবাদের সহিত জাতীয় অভ্যুদয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখক ও সাংবাদিক ওয়াল্টার ব্যাজহট্‌ (Water Bagehot) 'Physics and Politics' নামক গ্রন্থে লিখেছেন :—

Those kinds of morals and that kind of religion which tend to make the firmest and most effectual character are sure to prevail, all else being the same; and creeds and systems that conduce to a soft limp mind tend to perish except some hard extrinsic force keep them alive......strong beliefs win strong men, and then make them stronger, Such is no doubt one cause why Monotheism tends to prevail over Polytheism; it produces a higher, steadier character, calmed and concentrated by a great single object; it is not confused by competing rites, or distracted by miscellaneous deities. Polytheism is religion *in commission* and it is weak accordingly. But it will be said that the Jews, who were monotheist, were conquered by the Romans, who were polytheist. Yes, it must be answered, because the Romans had other gifts; they had a capacity for politics, a habit of discipline, and of these the Jews had not the least. The religious advantage was an advantage, but it was counterweighed."—যে নৈতিক আদর্শ ও যে ধর্ম্ম দৃঢ় চরিত্র ও কার্য্যক্ষম মানুষ সৃষ্টি করে, আর সব অবস্থা সমান হইলে, তাহাই জয়ী কিংবা প্রভাবশালী হয়। কোন কঠিন বাহ্য শক্তি বাঁচাইয়া না রাখিলে, যে সকল ধর্ম্ম দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেয় তাহারা লুপ্ত হয়; সবল ধর্ম্মবিশ্বাসই সবল মানুষকে জয় করিতে পারে, এবং তাহাদিগকে সবলতর করিতে পারে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এই কারণেই একেশ্বরবাদ বহুদেবতাবাদকে পরাজিত করে। একেশ্বরবাদের দ্বারা উন্নততর ও দৃঢ়তর চরিত্রের সৃষ্টি হয়, এবং একটি বিরাট উদ্দেশ্য থাকায় এই সকল চরিত্র অধিকতর শান্ত ও একাগ্র হয়। বিচিত্র অনুষ্ঠান দ্বারা উহা বিভ্রান্ত হয় না, নানা দেবদেবীদ্বারা উহা বিক্ষিপ্তচিত্ত হয় না। বহুদেবতাবাদ ধর্ম্মের বহু প্রভুর অধীন রূপ। সেইজন্য উহা দুর্ব্বল। কিন্তু এ আপত্তি হয় ত উঠিবে যে, ইহুদীরা ত একেশ্বরবাদী ছিল, তবু তাহারা বহুদেবতাবাদী রোমানদের দ্বারা বিজিত হয়। ইহার উত্তর এই যে, রোমানরা তাহা করিয়াছিল সত্য, কিন্তু সে তাহাদের অন্য গুণ ছিল বলিয়া। তাহাদের রাজনৈতিক দক্ষতা ছিল, নিয়মানুবর্ত্তী ও সংহত হইবার অভ্যাস ছিল। ইহুদীদের এসকল গুণের কোনটিই ছিল না। ধর্ম্ম হইতে যে সুবিধা পাওয়া যায় তাহা ইহুদীদের ছিল। কিন্তু রোমানদের অন্য গুণের দ্বারা ইহুদীদের এই সুবিধা নষ্ট হয়।

যাহা হউক, আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ জাতীয় একতা হ'তে পারে না, যতদিন একেশ্বরবাদ অবলম্বিত না হয়। মহাত্মা গান্ধীর ধর্ম্মের নাম যা-ই দেওয়া যাক্‌, তিনি বহুদেবতাবাদী নন। তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে হ'লে, 'God' বলেন; কোনও হিন্দু দেব দেবীর নাম করেন না। প্রার্থনাও ঈশ্বরের কাছেই করেন। অবশ্য বৈষ্ণব সঙ্গীত ব্যবহার ক'রে থাকেন; তা ত আমরাও করি।

আর একটা এই দেখা যায় যে, সব সাম্প্রদায়ের মিলিত প্রার্থনা যখন প্রয়োজন হয়, যেমন কংগ্রেসের কোন অনুষ্ঠানে বা অন্য কোনও বৃহৎ সম্মিলনে, তখন ব্রাহ্মসমাজের অনুমোদিত প্রার্থনাই হয়; এবং অনেক স্থলে কোনও ব্রাহ্মকেই সেই প্রার্থনা কর্‌তে বলা হয়। এতে বোঝা যায়, দেশ অজ্ঞাতসারে একেশ্বরবাদের দিকেই চলেছে; আমাদের জাতীয় জীবনে একেশ্বরবাদের প্রভাব দিন দিন প্রবল হচ্ছে। আমেরিকার জাতীয় জীবনে ইউনিটেরিয়ানদের প্রভাব বিশেষ প্রবল।

সার্ব্বজনিক উপাসনা।

আজকাল সার্ব্বজনিক দুর্গোৎসব হ'য়ে থাকে। সামাজিক দিক দিয়ে এটা হিতকর হ'লেও, একে ঠিক "সার্ব্বজনিক" বলা যায় না; কেন না, ইহাতে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের

লোকেরা যোগ দিতে পারেন না। গত বৎসর টালাতে যে দুর্গাপূজা হয়েছিল, তাতে পুরোহিতেরা সব জাতির লোক ছিলেন। এবারও ঐরূপ দুর্গাপূজা হবে। এ প্রকার পূজা পৌরাণিক হিন্দুদের মধ্যে 'সার্ব্বজনিক' বটে।

প্রকৃত সার্ব্বজনিক উপাসনা রামমোহন রায়ই প্রতিষ্ঠিত ক'রে গিয়েছেন। তাঁর রচিত ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট ডীডই এ বিষয়ে প্রমাণ। ঐ ট্রাষ্ট ডীড অনুসারে সকল জাতির, সকল সম্প্রদায়ের লোকই ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় আসতে পারেন; এবং উপাসনাও এমন ভাবে হওয়ার ব্যবস্থা রামমোহন রায় করেছিলেন, যাতে কোনও সম্প্রদায়ের লোকের তাতে যোগ দিতে বাধা না হয়। কেবল এরূপ উপাসনাই সার্ব্বজনিক উপাসনা।

সংস্কারের জন্য ধর্ম্ম নয়; ধর্ম্মের জন্য সংস্কার।

সংস্কারের জন্যই কি ধর্ম্ম চাই—একেশ্বরবাদ চাই? তা নয়। যে সব দেশে সমাজসংস্কারের প্রয়োজন আমাদের দেশের মত নাই, তাদেরও একেশ্বরবাদের প্রয়োজন আছে। সংস্কারের জন্য ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্যই সংস্কার। অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা যে সংস্কার করছেন, তা হ'তে ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারের ভাব ভিন্ন রকম। ব্রাহ্ম সংস্কারকেরা মনে করেন, পুরুষ নারীর আত্মা সমান; এজন্য তাঁরা নারীকে সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার দেন। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হিন্দু, মুসলমান সকলের আত্মা সমান; এজন্য তাঁরা জাতিভেদ দূর করতে চান। কোনও লৌকিক সুবিধার জন্য তাঁরা সংস্কার-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননি, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যই হয়েছেন। লৌকিক সুবিধার জন্য যে সংস্কার, তাও ভাল; তাতেও উপকার হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় জাতিভেদ সম্বন্ধে যে বিখ্যাত বক্তৃতা করেছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন যে জাতীয় উন্নতির জন্যও এই কুপ্রথা দূর হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তিনি ও অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতারা সমাজসংস্কার চেয়েছিলেন প্রধানতঃ ধর্ম্মের দিক থেকে।

তখনকার সংস্কারকদের সাহস কত ছিল! কুলীন কন্যাদের এবং বালবিধবাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করবার জন্য তাঁরা প্রাণ পণ করেছিলেন! এখন কেন নারীদের উপর অত্যাচার নিবারণে যুবকেরা প্রাণপণ করছেন না? ব্রাহ্মসমাজ কেবল সমাজসংস্কারের জন্য নয়। হিন্দু সমাজের সংস্কার হ'য়ে গেলেও ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন থাকবে।

কয়েকটি অত্যাবশ্যক সংস্কার।

এখন কয়েকটি অত্যাবশ্যক সংস্কারের কথা বলি। প্রথমতঃ, শিক্ষা-বিস্তার। দেশে শতকরা ৯২ জন নরনারী নিজের নামটি পর্য্যন্ত লিখতে জানে না। এই অবস্থা দূর করতে হবে। অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিবিধায়িনী সমিতি শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে অনেক কাজ করছেন। কিন্তু এই সমিতির যথেষ্ট সাহায্য দেশবাসীরা করছেন না। তার একটি কারণ হয় ত, এই সমিতির স্থাপয়িতা ও পরিচালক ব্রাহ্মসমাজ লোকপ্রিয় নন। এই সমিতির কার্য্যবিবরণ দৈনিক কাগজে পাঠালে প্রায়ই প্রকাশ হয় না। আমরা যদি বিবেকবিরুদ্ধ কাজ না ক'রে লোকপ্রিয় হ'তে পারি, তার চেষ্টা অবশ্য করতে হবে। কিন্তু দেশবাসীরও সাম্প্রদায়িক ভাব ছেড়ে' এরূপ ভাল কাজের সাহায্যে যথোচিত অগ্রসর হওয়া দরকার।

দেশের লোককে নাম লিখবার মত শিক্ষা দিতে পারলেই যে একটা কিছু হ'ল, তা বলছি না। সকল প্রকার উন্নতির সুযোগ যা'তে অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা পায়, তাই করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, দারিদ্র্য-দূরীকরণ। একজন লক্ষপতি হ'য়ে সুখে থাকবে, আর একজন নিঃস্ব হ'য়ে কেবলই ক্লেশ পাবে, সমাজের এই ব্যবস্থা কিছুতেই মানা যায় না। ধনের কতকটা সাম্য কি প্রণালীতে স্থাপিত হবে, তার সম্বন্ধে নানা মত আছে। কেহ কেহ বলেন, private property না থাকলে লোকে কাজ করবে না। এরও বিশেষ প্রমাণ চাই; কারণ, এর বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত দেখা যায়। রাশিয়াতে private property তুলে দেওয়ার পরও অনেক লোকে আনন্দে সকলের কাজ করছে। যা হোক, দারিদ্র্য দূর করবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করতে হবে।

তৃতীয়তঃ, গার্হস্থ্যজীবনে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মধর্ম্ম ভবিষ্যতে কি আকার ধারণ করবে কে বলতে পারে? তবে প্রত্যেক ব্রাহ্মের মধ্যে ধর্ম্মের আগুন আসা চাই। গৃহস্থ হ'য়ে ধর্ম্মসাধন করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ। স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছিলেন যে, উচ্চ ধর্ম্ম সাধন করতে হ'লে সন্ন্যাসী হ'তে হবে, পূর্ব্বে এই ভাব ছিল; রামমোহন রায় এই ভাব দূর ক'রে, গার্হস্থ্য আশ্রমই ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্র, এই মত প্রচার করেছিলেন। যথা—"To Rammohun Roy is due the credit of forcibly pointing out to learned Hindus that religion does not require one to be a jogi, a suttee or to go to the forest, but that home and society are the best surroundings of appropriate worship."—Speeches and Writings of Sir Gooroo Dass Banerjee; P. 361. এই মতই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সন্ন্যাসীর পক্ষে ধর্ম্মসাধন ত অপেক্ষাকৃত সোজা। আর, সকল সন্ন্যাসী যে অনাসক্ত হন, তাও নয়। ধর্ম্ম কার জীবনে কতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা প্রত্যেকের আচরণ দ্বারা বিচার করতে হবে। গৃহী থেকে ধর্ম্মসাধন বড় কঠিন; বাধাবিঘ্ন অনেক। গৃহে থেকে ধর্ম্মসাধন করতে গিয়ে আমরা বিষয়াসক্ত সংসারী হ'য়ে পড়ছি; অনাসক্ত থেকে ধর্ম্মসাধন করতে পারছি না। তবু চেষ্টা করতে হবে। আমরা চেষ্টা ছাড়ব না।

চতুর্থতঃ, আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠানগত ধর্ম্মের প্রতি লোকের খুব ঔদাসীন্য হয়েছে। তার কারণ এই যে, লোকে চারদিকে চেয়ে তার মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্ম অনেক সময় দেখতে পায় না। এই ঔদাসীন্য দূর করতে হ'লে, ধর্ম্মানুগত জীবন খাড়া করতে হবে; ব্যক্তিগত জীবনে প্রকৃত ধর্ম্ম

আয়ত্ত করতে হবে। ধর্ম্মানুগত জীবন দেখলে, ধর্ম্মের প্রতি লোকের ঔদাসীন্য হ্রাস পাবে।

নিজের চিন্তাশক্তির দ্বারা ও সাধনদ্বারা নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করতে হবে। ধর্ম্ম রাজ্যের সব সত্য আবিষ্কৃত হ'য়ে যায় নাই। এখনও এ রাজ্যে অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন আছে।

পঞ্চমতঃ, এদেশে আজকাল স্বাজাত্যের প্রতি অনুরাগ হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রতি বিরাগ জন্মেছে। এই বিরাগ ভাল নয়। পাশ্চাত্য দেশসকল হ'তে আমাদের যা গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণ করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দকে লোকে পূরা হিন্দু, পূরা প্রাচ্য, পূরা ভারতীয় স্বাজাতিক ব'লে মনে করেন। অথচ তিনিও ব'লে গেছেন, "তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতায় ঘোর হিন্দু হইতে পার?"

ষষ্ঠ কথা—শ্রমিক ও কৃষকদের উন্নতির কাজ করা প্রয়োজন। আমরা অনেকটা সহরে আবদ্ধ রয়েছি। গ্রামে বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্র। প্রথম কিছু করতে হ'লে সঙ্গী সহায় পাওয়া যায় না। যে মানুষ প্রথম কিছু করে, একাই করে; সঙ্গে থাকেন কেবল ভগবান্। গ্রামে থাকা এবং শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে কাজ করা এখন হয় ত আগেকার চেয়ে সহজ হ'তে পারে।

সপ্তম কথা—রাজনীতিকে বিশুদ্ধ করা। রাজনীতি সকল দেশেই দুর্গন্ধময় হ'য়ে গিয়েছে। তাকে বিশুদ্ধ করতে হবে।

অষ্টম কথা—সাহিত্যকে পবিত্র করা। অসৎ সাহিত্যে জাতীয় অধোগতি হয়। অসৎ সাহিত্য হ্রাস করতে হ'লে সৎ সাহিত্যের বৃদ্ধি করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ এবং আগেকার ব্রাহ্মেরা এখনও সাহিত্যক্ষেত্রে খুব বড় জায়গা অধিকার ক'রে আছেন। ব্রাহ্মসমাজকে সৎসাহিত্য বৃদ্ধি করবার দিকে চেষ্টা রাখতে হবে।

আমার শেষ কথা এই যে, ভগবদ্বিশ্বাস, নির্ম্মল জীবন, বিশুদ্ধ সত্য দৃষ্টিই প্রচারক জীবনের প্রধান সম্বল। সুশৃঙ্খল দলবদ্ধ অর্থাৎ organised ভাবে প্রচার করতে হ'লে, ধনবল, জনবল, সবই চাই। কিন্তু সাধু জীবন, সরলচিত্ত গৃহস্থ জীবনই প্রচারের প্রধান আয়োজন।

মানব জীবন

(১৪)

দায়িত্ব-বোধ

মানুষের মহত্ত্ব নির্ভর করে দায়িত্ববোধের উপর। কথায় কথায় আমরা বলি "লোকটার একটু দায়িত্ববোধ নাই," অর্থাৎ লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় না। এ রকম লোক বড়ই অশ্রদ্ধার পাত্র। এটা আমার কর্ত্তব্য, আমার দায়িত্ব, আমাকে এটা করতে হবে, না করলে অপরাধ হবে, অন্যায় হবে, অধর্ম্ম হবে, অন্যের এবং আমার ক্ষতি হবে, আমি হীন হব—এই বোধ যার যত সতেজ সে-ই সে-পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। এরূপ বোধ অন্তরে থাকলে, কোন কাজের ভার নিয়ে কেহ অবহেলা করতে পারে না, অসুবিধা কষ্ট স্বীকার ক'রেও কাজটা সম্পন্ন করবার চেষ্টা করে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন যুবক, তখন তাঁর এক বন্ধুকে সংস্কৃত কলেজে একটা অধ্যাপকের পদ দেবার কথা হয়। দুদিনের পরই তাঁর দরখাস্ত চাই। তিনি থাকতেন অনেক দূরে। বিদ্যাসাগর মনে করলেন বন্ধুর যাতে সেই কাজটি হয়, তা করা তাঁর কর্ত্তব্য, বন্ধুর প্রতি তাঁর দায়িত্ব আছে। এই ভেবে তিনি সমস্ত রাত্রি হেঁটে, প্রায় ২৫।৩০ মাইল পথ গিয়ে, সেই বন্ধুর দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়ে, পরদিন আবার অতটা রাস্তা হেঁটে ফিরে' এলেন। এত পরিশ্রম কেন করলেন? তাঁর দায়িত্ববোধ প্রবল ছিল ব'লে। এতটা না করলে অন্যায় হবে, বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য পালন হবে না—সেই জন্য।

প্রায় ৬৮ বছর পূর্ব্বে, একদিন কলিকাতায় ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হয়, অনেক গাছপালা পড়ে যায়, বাড়ী ধ্বসে যায়; সমস্ত রাস্তা জলে ডুবে যায়। সেদিন ব্রাহ্মসমাজে সন্ধ্যার সময় উপাসনার দিন। সেই দুর্য্যোগে কে আর মন্দিরে যাবে? দুজন লোক সেই দিনেই গিয়েছিলেন, একগলা জল ভেঙ্গে—কেশবচন্দ্র সেন এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। কেন গেলেন? তাঁদের মনে হয়েছিল, সপ্তাহে একদিন সকলে মিলে ব্রহ্মমন্দিরে পরমপিতার অর্চনা করা জীবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, ঝড় জলে তা বাদ দেওয়া উচিত নয়; তাই তাঁরা সেই ভয়ানক দিনেও মন্দিরে গিয়েছিলেন!

দায়িত্ববোধ সতেজ থাকলে, কোনও কাজ কষ্টকর হ'লেও মানুষ করে; দায়িত্ববোধ দুর্ব্বল হ'লে, অনেক সহজ কর্ত্তব্যও মানুষ করে না; ভগবানকে ফাঁকি দেয়, নিজেকে ফাঁকি দেয়, অপরকে ফাঁকি দেয়। নানা ওজর করে।

আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারি না। আমাদের অনেক চেষ্টা সফল হয় না। কিন্তু কোন চেষ্টাই বৃথা যায় না। কর্ত্তব্যপালনের জন্য আমরা যত চেষ্টা করি ততই জীবন শ্রেষ্ঠ হয়; কর্ত্তব্যপালন করতে গিয়ে মরে' গেলে, জীবন ধন্য হয়। যত শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য তত কষ্ট ক'রে, পরিশ্রম ক'রে, তা করতে হয়—এই ভগবানের মঙ্গল বিধি। চেষ্টা করাতেই আমাদের মহত্ত্ব।

দু'খানা নৌকা নদীতে যাত্রা করেছে। দু'খানাতেই হাল দাঁড় পাল সব আছে। এক নৌকার দাঁড়ী মাঝি সকলে নৌকা ঠিক পথে চালাবার জন্য ব্যস্ত, পরিশ্রম করছে, হাল ধ'রে আছে, পাল তুলছে বা নামাচ্ছে, দাঁড় টানছে। অপর নৌকার দাঁড়ী মাঝিসকল কেবল আমোদ প্রমোদ গল্প গুজব করছে, নৌকা কোন্ দিকে যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল নাই। এই দ্বিতীয় নৌকার গতি কি হবে ভেবে দেখ।

আমাদের প্রত্যেকের জীবন যেন এক একটি নৌকা। সমুদ্রে যাত্রা করতে হবে,—কত বাধাবিঘ্ন ঝড় তুফান আছে,—সে সব হ'তে আত্মরক্ষা ক'রে যেতে হবে। সে দায়িত্ব কার? কে জীবন-তরণী চালাবে? ঈশ্বর আছেন সকলের উপরে।

কিন্তু তিনি যে জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি বিবেক দিয়েছেন, তা কেন? এই জীবন-তরণী স্বর্গরাজ্যের দিকে, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতর অবস্থার দিকে চালাতে, সে সকলের ব্যবহার ক'রে আমরা ধন্য হব ব'লে। আমাকে আমার জীবন-নৌকা ঠিক পথে চালাতে হবে, এই বোধের নাম দায়িত্ববোধ। এতেই মানুষের মহত্ত্ব।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ধর্ম্মবন্ধু—নানা স্থানে বন্ধুগণ আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন, আহারের আয়োজন যথেষ্ট করেন, বরং মাত্রা ছাড়িয়ে, রাজসিক আয়োজনই অনেক স্থলে হয়। তাতে অর্থ সময় শক্তি মনোযোগ সবই যথেষ্ট ব্যয় হয়। এতে তাঁদের স্নেহ ভালবাসা যথেষ্ট প্রকাশ পায়।

কিন্তু ধর্ম্মবন্ধুর সঙ্গে সম্বন্ধ কি ঐ পর্য্যন্ত? আহারাদি অতি অসার ব্যাপার। তাতেই সব খরচ হ'য়ে গেল! দু'দণ্ড শান্ত হ'য়ে বস্‌বার, সুখ দুঃখের কথা বল্‌বার, প্রাণ মন ঢেলে দিয়ে উপাসনা কর্‌বার সময় ও ব্যবস্থা যদি না হয়, তা হ'লে হ'ল কি? শরীর-রাজ্যেই প'ড়ে থাকা হ'ল। আত্মার রাজ্যে যাওয়া হ'ল না, পরিচয়ও হ'ল না।

ধর্ম্মবন্ধু এলে, তাঁর স্নান আহার প্রভৃতির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে বৈ কি,—যেন কষ্ট না হয় সেই পর্য্যন্ত। কিন্তু আসল বস্তু উপাসনা, ভগবানের কাছে একত্রে বসা। সেজন্য শক্তি মন পয়সা স্থান দিতে হবে। উপাসনার জন্য ফুল ধুপ সঙ্গীত ইত্যাদির ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। তরকারী ৩টা করা বাহুল্য। উপাসনার বেলায় সব শূন্য—অতি দৈন্য। পরম বন্ধুকে ছেড়ে ধর্ম্মবন্ধুতা হয় না; যেমন আহারের আয়োজন কর্‌তে হয়, তার চেয়ে শত গুণ বেশী মনপ্রাণ দিয়ে উপাসনার আয়োজন কর্‌তে হয়। তা না হ'লে যাওয়া আসা, দেখা সাক্ষাৎ সব বৃথা।

এবিষয়ে ব্রাহ্মগণের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। নবীনচন্দ্র রায় বড় চাকরী কর্‌তেন, লাহোরের সমস্ত বড় কাজের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, সংবাদ পত্র, মাসিক পত্র, বই লিখ্‌তেন ও পরিচালন কর্‌তেন, বহু লোককে প্রতিপালন কর্‌তেন, দাসদাসী গাড়ী ঘোড়া ছিল, রাজা মহারাজার সঙ্গে বন্ধুতা ছিল, তবু নিত্য ধর্ম্মসাধনে যথেষ্ট সময় দিতেন, এবং কোন প্রচারক বা ধর্ম্মবন্ধু এলে, বহু সময় তাঁর সঙ্গে সাধনে ও প্রসঙ্গে কাটাতেন; কখন কখন অফিস হ'তে ছুটী নিতেন। কোন ধর্ম্মবন্ধু গৃহে আস্‌বার পূর্ব্বে নিজের পত্নী সন্তানগণ এবং ভৃত্যগণকে সেজন্য প্রস্তুত কর্‌তেন। বন্ধুগণকে বল্‌তেন, এবং সকলে মিলে বিশেষ আয়োজন কর্‌তেন, যেন তাঁর সঙ্গ ভালরূপে করা যায়, উপাসনা আলোচনা যেন ভালরূপ হয়, পরমবস্তু যেন লাভ হয়। সেই ভাব চাই।

রাজা রামমোহন রায় ও সতীদাহ

যে যুগে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে যুগের বাংলা দেশের সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার করিয়া দেখিলে, রাজার আবির্ভাবকে একটা অভাবনীয় আকস্মিক ব্যাপার বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। কারণ, সে সময়ের আমাদের সামাজিক অবস্থা সেই অতি বিরাট অভ্রভেদী ব্যক্তিত্বকে জন্মদান করিবার মত উদারতা, প্রসারতা ও সামর্থ্য লাভ করে নাই। সমষ্টিগত ভাবে সামাজিক উন্নতির ক্রমবিকাশ যতখানি অগ্রগমন করে, ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকটি ব্যক্তি সেই অগ্রগতির ফল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু রাজাকে এই নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। নিশাবসানে উষার প্রথম অরুণরশ্মি হিমালয়ের গগনস্পর্শী তুষার-ললাটে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিয়া তুলে, কিন্তু সেই সময়ে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ তমসাচ্ছন্ন নিম্ন বনভূমি ঝিল্লি-গুঞ্জনে ঘুমন্ত পুরীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। রাজা রামমোহনের উন্নত ললাটেও জ্ঞান ও প্রজ্ঞার শুভ্র আলোকচ্ছটা যখন বিজয়-বৈজয়ন্তীর ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল, ঠিক তখন তাঁহার চতুঃপার্শ্বস্থ সমসাময়িকগণ তাঁহার তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত বলিয়া বোধ হইতেছিল। সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি প্রভৃতি এমন কোন বিভাগ নাই, যেখানে রাজা রামমোহন রায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পতিত হয় নাই। মানবজাতির প্রতি গভীর সহানুভূতি লইয়া রাজা আজীবন সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছেন এবং সকল সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন। রাজার এই বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্যক পর্য্যালোচনা করিবার মত স্পর্দ্ধা ও সামর্থ্য এই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর লেখনীর নাই। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। যে সতীদাহ ও সহমরণ প্রথা বাংলার সমাজের বক্ষের উপর গুরুভার শিলার মত চাপিয়া বসিয়াছিল, এবং যাহার স্মৃতি এখনও চিত্ত কণ্টকিত করিয়া তুলে, সেই কুপ্রথা দমনের জন্য রাজার আরব্ধ কর্ম্ম কি প্রকারে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল, তাহাই আজ আমরা পরম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া ধন্য হইব।

মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, অনেক সময় কোন একটি প্রাত্যহিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের চিত্ত এরূপ ভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠে যে, তাহাদের পরবর্ত্তী জীবন সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত এবং পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কপিলাবস্তুর রাজ-কুমারের শবদেহদর্শনে যে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহারই ফলস্বরূপ তিনি অর্দ্ধজগৎব্যাপী যে অক্ষয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজা রামমোহন তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের দ্বিতীয়া স্ত্রী অলকমণি বা অলকমঞ্জরীর সহমরণ ব্যাপার দর্শন করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এবং যতকাল পর্য্যন্ত জীবিত

থাকিবেন ততকাল এই ভয়ঙ্কর প্রথা রহিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু রাজার সময়ে চিতার আগুনে জীবিত সতীর মৃত্যু কে না দেখিত? ১৮১১ সালে এই সতীদাহ হইয়াছিল। মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু এই ঘটনার যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করা গেল। "চিতানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, সহগামিনী স্ত্রীর আর্ত্তনাদ যাহাতে কাহারও কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়, তজ্জন্য প্রবল উদ্যমে বাদ্যভাণ্ড বাজিতেছে, সে প্রাণ ভয়ে চিতা হইতে গাত্রোত্থান করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু স্বজনেরা তাহার বক্ষে বাঁশ দিয়া চাপিয়া রাখিতেছে; এই সকল নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর কার্য্য দেখিয়া রামমোহন রায়ের চিত্তে দয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, এবং তদবধি তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে-পর্য্যন্ত না সহমরণ প্রথা রহিত হয়, সে-পর্য্যন্ত তন্নিবারণের চেষ্টা হইতে তিনি কখনই বিরত হইবেন না।"

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের শাসনকালে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে এই ভয়ঙ্কর কুপ্রথা ভারতভূমি হইতে বিদূরিত হয়। কিন্তু ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ হইতেই গভর্ণমেণ্ট সতীদাহরূপ কুপ্রথা-রাক্ষসীকে বিনষ্ট করিবার জন্য সময়ে সময়ে চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৮২৯ সালের পূর্ব্বে সে চেষ্টা সুফল প্রসব করে নাই। আজ এই বিংশ শতাব্দীতে সতীদাহ-নিবারণের একশত বৎসরেরও অধিক কাল পরে, আমরা এই কুপ্রথার ভীষণতা, নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতার প্রকার ও মাত্রা কল্পনাও করিতে পারি না। সে যুগে এ দেশের সকল বর্ণের হিন্দুগণ এই নৃশংস ও অস্বাভাবিক দেশাচার প্রচলিত রাখিবার জন্য সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রবল প্রতিপক্ষের প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হন। রাজা রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভার সহিত গোঁড়া হিন্দুদের ধর্ম্মসভার বিবাদের একটি প্রধান কারণ এই সতীদাহ। দেশের অনাথা বিধবাগণকে দগ্ধ করিয়া হত্যা করিবার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়ায় ধর্ম্মসভার সভ্যগণ বিবিধ উপায়ে ব্রহ্মসভার অনিষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তখন ধর্ম্মসভার উৎসাহী সভ্য ছিলেন—রাজা রাধাকান্ত দেব সভাপতি। সুতরাং এইরূপ সাংসারিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, কেবলমাত্র সত্যের ভাবী উন্নতির উপর নির্ভর করিয়া, নিপীড়িতা স্ত্রীজাতির প্রতি অপরিমেয় সমবেদনা ও করুণা লইয়া রাজা স্বীয় কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার হিন্দু বিধবার মৃত স্বামীর অনুগমন করা শাস্ত্রসম্মত কিংবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, এবং ইহা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত হইলেও হিন্দুধর্ম্মের উপর গুরুতর আঘাত না করিয়া শীঘ্র উঠাইয়া দেওয়া যায় কি না, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। সহমরণোদ্যতা স্ত্রীলোকগণকে যাহাতে তাঁহাদের আত্মীয়েরা সম্পত্তির লোভে অন্যায়ভাবে উত্তেজিত করিয়া তাঁহাদের উপর বলপ্রয়োগ করিতে না পারে—মাদকদ্রব্য বা ঔষধ সেবন করাইয়া সহমরণে সম্মতি আদায় করিতে না পারে, কিংবা অল্প বয়স বা অন্য কোন কারণে হিতাহিতনির্দ্ধারণে অক্ষমা অবলাগণ যাহাতে অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত না হইতে পারে, তজ্জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাহাতে সতীদাহ-প্রথা লোপ পাইল না। বরং ১৮১২ সালে সতীদাহ-প্রথা সকল শ্রেণীর হিন্দু প্রচলিত রাখিতে বিশেষ যত্নবান বলিয়া তাহা রহিত করা অসম্ভব, নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার এরূপ মত প্রকাশ করেন।

ক্রমশঃ

জ্যোৎস্নাময় দাসগুপ্ত

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে:—

বিগত ১০ই নবেম্বর রাঁচি নগরীতে মহারাণী সুনীতি দেবী ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পিতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কার্য্যকে বিবিধ প্রকারে অগ্রসর করিবার জন্য সর্ব্বদা বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে তাঁহার অতি প্রিয় ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সান্ত্বনা এই, তিনি জীবনে যে সকল দুঃখ শোকে ক্লেশ পাইয়াছেন, তাহার অবসান হইল। শান্তিদাতা পিতা তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে চির-শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

নামকরণ ও জাতকর্ম্ম—বিগত ৩১শে অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে রায় সাহেব প্যারীমোহন দাসের দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর (শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ ও শ্রীমতী অনুপমা দাসের পুত্র ও দ্বিতীয়া কন্যার) যথাক্রমে নামকরণ ও জাতকর্ম্ম (জন্ম ১৮ই আগষ্ট ১৯৩২) অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শিশুকে কল্যাণকুমার নাম প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ২৲ ও দাতব্য বিভাগে ২৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ২২শে অক্টোবর বরিশাল নগরীতে শ্রীযুক্ত অনিমেষ দাস গুপ্তের প্রথম পুত্রের (তৃতীয় সন্তান) নামকরণ ও অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। পিতামহ শ্রীযুক্ত মন্মথ-মোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ এবং শিশুকে অশোক-রঞ্জন নাম প্রদান করেন। এই উপলক্ষে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে এবং প্রীতি ভোজনের ব্যবস্থা ছিল।

মঙ্গলময় বিধাতা শিশুদিগকে সতত কল্যাণের বর্দ্ধিত করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ১৮ই অক্টোবর বোম্বাই নগরীতে মিঃ ডি জি বৈদ্যের কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী তারাবাই ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দেবের পুত্র শ্রীমান প্রফুল্লচন্দ্রের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। ডাক্তার ভি এ সুখটাঙ্কার আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

দান—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মল্লিক পরলোকগত পিতা বাবু বেচারাম মল্লিকের সপ্তম বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচার বিভাগে ২৲ ও দাতব্য বিভাগে ২৲ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রিয় দেব পিতামহ পরলোকগত শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ২৲ প্রচার বিভাগে ২৲ ও সাধনাশ্রমে ১৲ দান করিয়াছেন। এই সমস্ত দান সার্থক হউক এবং পরলোকগত আত্মাসকল চিরশান্তি লাভ করুন।

বরমা ব্রাহ্মসমাজ—বরমা ব্রাহ্মসমাজের একবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত রূপে সম্পন্ন হইয়াছে:—

১০ই কার্ত্তিক সন্ধ্যায় সঙ্কীর্ত্তন ও উদ্বোধন। ১১ই কার্ত্তিক সমস্তদিনব্যাপী উৎসব—প্রাতে উষাকীর্ত্তন ও উপাসনা, দ্বিপ্রহরে পাঠ, অপরাহ্নে সঙ্কীর্ত্তন ও সন্ধ্যায় উপাসনা হইয়াছে। ১১ই কার্ত্তিক প্রাতে শান্তিবাচন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। কুমারী সুলেখা সেন বি, এ, ও কুমারী সুরেখা সেন শিক্ষয়িত্রীগণ পাঠ, প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি করিয়াছেন। উৎসবে গ্রামের ভদ্র মহোদয়গণ যোগদান

করিয়াছেন এবং 'চরিত্রনগণ' কীর্ত্তন করিয়াছেন। কীর্ত্তনান্তে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

প্রচার—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী নিম্নলিখিত রূপে প্রচার কার্য্য করিয়াছেন :—

অক্টোবরের প্রথমে কুমিল্লা ব্রাহ্ম সম্মিলনীতে গমন করিয়া তথায় ৪।৫ দিন অবস্থান করেন। এই সময় মধ্যে সম্মিলনীতে একদিন আচার্য্যের কার্য্য, দুই দিন সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন, ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন ও অনাথ ব্রাহ্ম ধনভাণ্ডার বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন, এবং প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজে পরস্পরের ভিতর ঘনিষ্ঠতা-বৃদ্ধির উপায় প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। ৭ই অক্টোবর প্রাতে রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহের ভবনে নরনারীগণের একটি বিশেষ সম্মিলিত উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য এবং "যেখানে ধর্ম্ম সেখানে জয়" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

ঢাকায় থাকিয়া ৮ই অক্টোবর হইতে ১০ই নভেম্বর এই এক মাস কাল মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবে কার্য্য করিয়াছেন—৯ই, ২৩শে, ৩০শে, অক্টোবর এবং ৬ই নবেম্বর ঢাকা ব্রহ্মমন্দিরে সায়ংকালীন উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য এবং "উপাসক জীবনে ভগবানকে আবাহন ও বিসর্জ্জন", "আত্মার অমরত্ব ও ব্রহ্মোপলব্ধি", "সময়ের মত আর শিক্ষক নাই" এবং "পৃথিবীর মত আর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নাই" এই চারিটী বিষয়ে উপদেশ প্রদান। চারি মঙ্গলবার সঙ্গতসভার বিশেষ অধিবেশনে তিন দিবস সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন ও শাস্ত্রব্যাখ্যা, এবং একদিন অনুতাপ বিষয়ে আলোচনা করেন। সভাপতিরূপে প্রতিদিনই প্রার্থনা ও কার্য্য পরিচালনা করেন। কোন কোন দিন উপস্থিতির সংখ্যা ৭০।৮০ জনও হইয়াছে। ৮ই অক্টোবর ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনা অন্তে, "ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনের কোন্‌টী প্রবল" এই বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন ও উপসংহার করেন। ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিদিনের প্রাতঃকালীন উপাসনায় ৬।৭ দিন আচার্য্যের কার্য্য, সঙ্গীত এবং ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন।

১১ই অক্টোবর গ্যাণ্ডারিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্রের ভবনে অনেক নরনারীর সম্মিলনে সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন ও আচার্য্যের কার্য্য এবং "পরিবারে ভগবানের মঙ্গল ভাব দর্শন" বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ২৭শে অক্টোবর সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল জমাট সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন এবং উদ্বোধন, আরাধনা, প্রার্থনার পার্থক্য প্রদর্শনে গীত সঙ্গীতগুলির ব্যাখ্যা করেন। ২৬শে অক্টোবর প্রাতে রমণাস্থ বিধবাশ্রমে ২২।২৩টী কন্যা ও শিক্ষয়িত্রীগণকে লইয়া উপাসনা এবং ধর্ম্মলাভের সহজ তত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ১০ই অক্টোবর প্রাতে রায় বাহাদুর ডাক্তার গুরুপ্রসাদ মিত্রের ভবনে তাঁহার পুত্রের রোগমুক্তির জন্য বিশেষ ভাবে উপাসনা ও সঙ্গীত করেন। রায় বাহাদুর রেবতীমোহন দাসের ভবনে সাপ্তাহিক উপাসনায় দুই বুধবার, বাবু জয়চন্দ্র দাসের ভবনে এক শুক্রবার, এবং বাবু অজিতকুমার দাসের ভবনে এক বৃহস্পতিবার উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য ও সঙ্গীত এবং বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

২৮শে আশ্বিন উয়ারীতে বাবু বীরেন্দ্রনাথ বসুর পঞ্চাশৎ জন্মদিনে, ২০শে কার্ত্তিক টীকাটুলিস্থ জাপান-হাউসে শ্রীমতী প্রীতিলতা তাকেদারের ষড়বিংশ জন্মদিনে, এবং ২৩শে কার্ত্তিক বাবু অমলচন্দ্র বসুর অষ্টাত্রিংশ জন্মদিনে আচার্য্যের কার্য্য, এবং সঙ্গীত ও উপদেশ প্রদান করেন। ২৯শে আশ্বিন গ্যাণ্ডারিয়ার বাবু অনাথবন্ধু চৌধুরীর পুত্রের মৃত্যু দিনে, ১১ই কার্ত্তিক আরমাণি-টোলায় ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভবনে তাঁর পিতা বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের পরলোকগমনে, ৭ই কার্ত্তিক সূত্রাপুরে বাবু সত্যেন্দ্রনারায়ণ দাসের পত্নীর বার্ষিক পারলৌকিক অনুষ্ঠানে, এবং ১৯শে কার্ত্তিক বাবু অক্ষয়কুমার সেনের শ্বশুরের ২য় বার্ষিক পরলোকগমন-দিনে আচার্য্যের কার্য্য ও শাস্ত্রপাঠ, এবং কোন কোন স্থানে সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন করেন। দুই সোমবার রায় বাহাদুর ডাক্তার গুরুপ্রসাদ মিত্রের ভবনে সাধকমণ্ডলীর অধিবেশনে সঙ্গীত, উপাসনা এবং আলোচনা করেন। এবং ৭ই অক্টোবর এই মণ্ডলীর বার্ষিক উৎসবে আচার্য্যের কার্য্য, সঙ্গীত এবং "সাধনপথের সহযোগিতা" বিষয়ে নিবেদন করেন। ১২ই অক্টোবর আরমাণি টোলাস্থ নববিধান সমাজ মন্দিরে "অর্থ ও পরমার্থ" বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

২১শে অক্টোবর নারায়ণগঞ্জ ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য ও সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন করেন এবং পবিত্রতা সাধন বিষয়ে উপদেশ দেন। উপাসনার পূর্ব্বে উপাসক বন্ধুদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন। ১৬ই অক্টোবর বাবু রাজমোহন দাসের শাশুড়ীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য এবং পারলৌকিক তত্ত্ব পাঠ করেন। ২রা নভেম্বর বাবু কানাই লাল ঘোষের পত্নীর সাম্বৎসরিক পারলৌকিক অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য সঙ্গীত এবং উপদেশ প্রদান করেন।

১৯শে অক্টোবর শুভাড্যা গ্রামে বাবু জয়চন্দ্র দাসের ভবনে তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য ও উপদেশ প্রদান করেন। গ্রামের নরনারীগণের সম্মিলনে দেড়শতাধিক লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। শিশুদ্বয়ের নাম জ্যোতিঃভূষণ ও প্রীতিভূষণ রাখা হইয়াছে।

বাবু অমলচন্দ্র বসু, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বাবু সত্যেন্দ্রনারায়ণ দাস গুপ্ত, বাবু ব্রহ্মানন্দ দাস, এবং বাবু কল্যাণকুমার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি, অধিকাংশ কার্য্যে সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন মৃদঙ্গবাদ্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসম্মিলনীতে মনোমোহন বাবু সঙ্কল্প লইয়াছেন, যে যে অনুষ্ঠানে তিনি আচার্য্যের কার্য্য করিবেন সেখানেই অনাথ ধনভাণ্ডারের জন্য কিছু অর্থ প্রার্থনা করিবেন। প্রকৃত পক্ষে ৭।৮টী অনুষ্ঠানে তাহাই রক্ষিত হইয়াছে। খুব সম্ভব অগ্রহায়ণের সাম্বৎসরিক উৎসব অর্থাৎ অগ্রহায়ণের শেষ পর্য্যন্ত তিনি ঢাকাতে অবস্থান করিবেন।

ব্রাহ্মপরিবারের লোক সংখ্যা গণনা (Census)

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর গত বার্ষিক অধিবেশনে সম্মিলনীর কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রতি, আসাম, বাঙ্গলা ও বিহার—তিন প্রদেশের ব্রাহ্ম সংখ্যা গণনার (Census গ্রহণের) ব্যবস্থার ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। তদনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা একটি Census কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই কমিটি কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহায়তা গ্রহণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং Census গ্রহণের জন্য মুদ্রিত ফরম প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বত্র পাঠাইতেছেন। তিন প্রদেশের ব্রাহ্মসমাজের যোগে Census গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। মুদ্রিত ফরম যদি ভুল বশতঃ কোথাও পাঠান না হইয়া থাকে, কিম্বা যদি কেহ Census গ্রহণ সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সম্মিলনীর সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলেই প্রয়োজনীয় সংবাদ কিম্বা Census ফরম পাইতে পারিবেন।

এই গুরুতর কার্য্য সুনির্ব্বাহের জন্য Census কমিটি ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট বিনীত ভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই সাহায্য না পাইলে কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।

বিনীত

3, Foulder street, শ্রীমথুরানাথ গুহ—সম্পাদক,

Wari P. O. Dacca. পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ কর্ত্তৃক ৩০শে কার্ত্তিক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ।

Registered No. 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৫ ভাগ
১৬শ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার ১৩৩৯, ১৮৫৪ শক,
ব্রাহ্মসংবৎ ১০৩
2nd December, 1932.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা, তোমার এই বিচিত্র সংসারে অশেষ প্রকার কার্য্যের মধ্যে, তুমি আমাদিগকে আমাদের উন্নতি ও কল্যাণের জন্যই তোমার সহকর্ম্মী ও পরস্পরের সহযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি আমাদের সকলের উপরই বিশেষ বিশেষ কর্ম্মভার অর্পণ করিয়াছ; আবার, অনেক কাজই পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ করিয়া দিয়াছ। আমরা যদি আমাদের কার্য্য যথাযথরূপে সম্পন্ন না করি, তবে তোমার কাজ অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকিলেও, আমাদের উন্নতি ও কল্যাণ লাভেই অধিকতর ব্যাঘাত ঘটে—তোমার কাজ তুমি যেরূপেই হউক সম্পন্ন করাইয়া লও। তেমনি, আমরা যদি পরস্পরকে সাহায্য করিতে ও পরস্পরের সহায়তা গ্রহণ করিতে বিরত থাকি, তবে যে শুধু কাজগুলিই সুসম্পন্ন হইতে পারে না, তাহা নহে, আমাদের বিকাশের পথেও গুরুতর বাধা উপস্থিত হয়।—আমরা ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ হইয়া যাই, প্রেম ও মহত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হই। তোমার কার্য্যসাধনের জন্য তুমি অন্যরূপ ব্যবস্থাও করিতে পারিতে। শুধু আমাদের কল্যাণের জন্যই এরূপ করিয়াছ। তথাপি হে অন্তরদর্শী দেবতা, তুমি জান আমরা অনেক সময় তোমার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, আমাদিগকে যে সর্ব্বোপরি যথার্থতঃ তোমার সহকর্ম্মী হইতে হইবে, সে কথা ভুলিয়া, শুধু বাহিরের কার্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে যাই, এবং তোমার কার্য্যও পণ্ড করি, আমাদেরও মহা অকল্যাণ সাধন করি। হে করুণাময় পিতা, তুমি আমাদিগকে সে শুভবুদ্ধি প্রদান কর, যাহাতে আমরা সর্ব্বদা একমাত্র তোমারই নির্দ্দেশ মানিয়া সকল কার্য্য করিতে পারি। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক।

চয়ন

জানিও "করা" অপেক্ষা "হওয়া" অনন্ত গুণে উচ্চতর; সত্য প্রচার করা অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে সত্য হওয়া উচ্চতর ও অধিকতর স্থায়ী সেবা; অপরকে পবিত্র হইবার পক্ষে সাহায্য করিতে জীবন ব্যয় করা অপেক্ষা অন্তরে পবিত্র হওয়া তোমাকে ঈশ্বরের নিকটতর করে, মানবমণ্ডলীর অধিকতর উপকার সাধন করে, ও শ্রেষ্ঠতর ফল প্রসব করে। ন্যায় কার্য্যে সাহায্য করা অপেক্ষা ন্যায়বান হওয়া শ্রেষ্ঠতর; সুসংবাদ (ধর্ম্মশাস্ত্র) শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা খৃষ্টান (ধার্ম্মিক) হওয়াতে অধিকতর খৃষ্টান (ধার্ম্মিক) প্রস্তুত করে।

বিশপ টেম্পল

সকল প্রকারে সুখী ও পূর্ণ হইবার সর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্বতম ও নিশ্চিততম পথ সম্বন্ধে যদি তোমাকে কাহারও বলিতে হয়, তবে তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই তোমার জীবনে যাহা কিছু ঘটে তাহার প্রত্যেকটির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া ও তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করাকে ব্রত রূপে গ্রহণ করিতে বলিবেন। কেন না, ইহা নিশ্চিত যে, তোমার জীবনে যে-কোনও আপাত দৃশ্যমান বিপদ ঘটুক না কেন, তুমি যদি তাহার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও ও তাঁহার প্রশংসাবাদ কর, তবে তুমি উহাকে আশীর্ব্বাদে পরিণত করিলে। সুতরাং তুমি যদি অলৌকিক ক্রিয়া করিতে পারিতে, তাহা হইলেও এই কৃতজ্ঞচিত্ততার ভাবদ্বারা তোমার যে কল্যাণ সাধন করিতে পার, তাহা অপেক্ষা অধিকতর কিছু করিতে পারিতে না; যেহেতু, ইহা একটি মাত্র উচ্চারিত বাক্যের দ্বারা ক্ষত শুষ্ক করিয়া দেয়, এবং যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহাকে সুখে পরিণত করে।

অন্তরের ও বাহিরের প্রত্যেকটি বিপদ, প্রত্যেকটি নিরাশা, বেদনা, অশান্তি, প্রলোভন, অন্ধকার ও শূন্যতা, আত্মবিলোপ-

সাধনের এবং পবিত্রতার সহিত তোমার পূর্ণতর যোগস্থাপনের একটা সত্য সুযোগ ও কৃতার্থকর সুবিধা জানিয়া, দুই হাত পাতিয়া গ্রহণ কর। অন্তরের অথবা বাহিরের কোনও বিপদকে অন্য চক্ষে দেখিও না; উহার সম্বন্ধে অন্য সকল প্রকার চিন্তা অগ্রাহ্য বলিয়া দূর করিয়া দাও; তাহা হইলে সকল প্রকার দুঃখ বিপদ পরীক্ষা তোমার সম্পদের আনন্দকর দিনে পরিণত হইবে। যে অবস্থাতে ঈশ্বরে সর্ব্বোচ্চ বিশ্বাস ও পূর্ণতম আত্মসমর্পণ প্রকাশের প্রয়োজন হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা।

উইলিয়াম ল

সম্পাদকীয়।

ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য ও সহযোগিতা—প্রত্যেক মানুষ যেমন এক পৃথক ব্যক্তি, তেমনি এক পরিবারের বা এই বিশ্ব সংসারেরও একটি অচ্ছেদ্য অংশ। অপর সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যেমন সে থাকিতে পারে না, তেমনি অংশ বলিয়া অপর সকলের মধ্যে সে আপনার বিশেষত্ব হারাইয়া, তাহাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একও হইয়া যাইতে পারে না। বাহিরের অস্তিত্ব ও জীবন সম্বন্ধে যেমন ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, কার্য্যাদি সম্বন্ধেও তেমনি লক্ষিত হইবে। অনেক কাজ তাহাকে অপর সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়াই করিতে হয়—সহযোগিতা গ্রহণ ও প্রদান না করিলে কিছুতেই চলে না। আবার, অন্য কতকগুলি তাহাকে অপরের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়াও করিতে হয়, সহযোগিতালাভের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে চলে না। সেরূপ না করিলে তাহার জীবনের কোনও সার্থকতাই থাকে না—নিজের নিজের ও অপর সকলের কল্যাণ সম্যক্ প্রকারে সাধিত হইতে পারে না, বিশ্ববিধাতার ইচ্ছা ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই যাওয়া হয়। তাই সর্ব্বদা সকল বিষয়ে উভয়ের যথোচিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই চলিতে হইবে,—তাহার উপরই সকলের প্রকৃত উন্নতি ও কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। ব্যক্তি সম্বন্ধে যাহা সত্য, অনুসন্ধান করিলে প্রমাণিত হইবে, পরিবার, সমাজ, সম্প্রদায় বা জাতি সম্বন্ধেও তাহাই সত্য।

ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক পরিবার, সমাজ, সম্প্রদায় বা জাতিরও একটা ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য আছে, বিশেষ কিছু করণীয় বা কর্ত্তব্য আছে—অপর কোনও একটির দ্বারা কখনও সে কাজ সম্যক্ প্রকারে সাধিত হইতে পারে না; আর, তাহা অবহেলা করিলেও উহার কোনও সার্থকতাই থাকে না। অংশীভূত প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও, তাহাকে কিছু পরিমাণে খর্ব্ব করিয়াই, একটা সাধারণ উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিগত মিল লইয়াই, এই সমস্ত সমষ্টি স্বাভাবিক নিয়মে গঠিত হয়। এই সাধারণ প্রকৃতিগত মিল ও উদ্দেশ্যের একতা হইতেই সমষ্টির একত্ব ও বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন। সমষ্টির একত্ব ও বৈশিষ্ট্য না থাকিলে, উহা কখনও আপনাদের বিশেষ উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারে না, উন্নতি এবং বিকাশও লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই সঙ্গে ইহাও স্মরণে রাখা আবশ্যক যে, যদিও অংশীভূত প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে কিছু পরিমাণে খর্ব্ব না করিলে সমষ্টির একত্ব সাধিত হইতে পারে না, তথাপি সেই ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিতে গেলে যে শুধু ব্যক্তিরই বিকাশের পথ রুদ্ধ করা হইল, সর্ব্বনাশ সাধিত হইল তাহা নহে, সমষ্টির বিশেষ উদ্দেশ্য যথাযথরূপে সাধনের পথেও গুরুতর ব্যাঘাত উপস্থিত করা হইল, উন্নতির দ্বার অর্গলবদ্ধ করা হইল। আধ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত কার্য্যাদি সম্পর্কে কোনও আলোচনা উপস্থিত করিবার উদ্দেশ্য আমাদের না থাকিলেও, ব্যক্তিত্ব ও সমষ্টির সম্বন্ধ-বিষয়ক এই কথাটি ভুলিলে চলিবে না। কেননা পরিবার, সমাজ, সম্প্রদায় বা জাতির যাহার কথাই বলি না কেন, ইহারা প্রত্যেকে সমষ্টি হইয়াও, বৃহত্তর সমষ্টির সম্পর্কে ব্যষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তির ন্যায় ইহাদেরও কেহই অপরের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া সম্যক্ প্রকারে নিজ কার্য্য সম্পাদন, উদ্দেশ্য সাধন ও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। ইহার জন্য সহযোগিতা পাওয়া যে প্রকার প্রয়োজনীয়, অপরের সহযোগিতা করাও সেই প্রকার অনিবার্য্যরূপেই আবশ্যক। নিজের ও অপর সকলের বা সমগ্রের মঙ্গলের জন্যই ইহা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে অনেক সময় নিজের একটু ব্যক্তিত্ব খর্ব্ব করিয়া, অপরের সঙ্গে একটা সাধারণ মিলন-ভূমিতে দাঁড়াইয়া ঐক্য স্থাপন করা আবশ্যক হয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ঐক্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে নিজের বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতে হইবে এবং নিজের সমস্ত বিশেষ কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, এরূপ কথা কিছুতেই বলা যায় না। সেরূপ করিলে সকলেরই অকল্যাণ সাধন করা হয়। আর, তাহা যে প্রকৃত পক্ষে সহযোগিতাও নয়, অবিমিশ্র দাসত্ব বা আত্মবিলোপসাধনই, সে কথাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ঐক্য ও মিলন যতই বাঞ্ছনীয় হউক না কেন, সেই হেতু কাহারও বিলোপসাধন বা বৈশিষ্ট্যবিসর্জ্জন কোনও দিক হইতেই কর্ত্তব্য বা কল্যাণকর হইতে পারে না। একের কাজ কোনও ক্রমেই অপরের দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে সাধিত হইতে পারে না—এরূপ করিতে গেলে কোনও না কোন বিষয়ে অপূর্ণতা থাকিয়া যাইবেই। কোনও না কোনও অংশ বাদ দিয়াই মিলন ও ঐক্য সাধন করিতে হইবে। সেই পরিত্যক্ত অংশ অবশিষ্ট থাকিবেই।

ব্রাহ্মসমাজ যে-সকল সংস্কারের জন্য এত দিন নানা লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের মধ্যেও কঠোর সংগ্রামে নিযুক্ত ছিল, তাহার কোন কোনটা অপরে কিছু পরিমাণে গ্রহণ করিতেছে দেখিয়া, শুধু বাহিরের নয়, ভিতরের ও কেহ কেহ মনে করিতেছে, ব্রাহ্মসমাজের কাজ শেষ হইয়াছে, তাহার পৃথক অস্তিত্বের কোনও প্রয়োজন নাই, অথবা অপরের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যেটুকু করা যায় তাহা করিলেই যথেষ্ট হইবে, অপর সকল হইতে

পৃথক হইয়া, অপরের বিরাগ ও বিরোধ উৎপন্ন করিয়া কিছু করা উচিত নয়। ইহা চিন্তাহীনতারই পরিচায়ক। ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত সকল সংস্কার-চেষ্টা যে এখন পর্য্যন্ত কেহই সমগ্র ভাবে ও সম্পূর্ণ পরিমাণে গ্রহণ করে নাই, তাহা প্রদর্শন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই—চারিদিকে চাহিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইয়াছে স্বীকার করিয়া লইলেও, তাহার অস্তিত্বলোপের কোনও কারণ দেখা যায় না। তাহার অন্য অনেক কাজও আছে। সে-সকল কাজ এখন পর্য্যন্ত অন্য কেহ গ্রহণ করে নাই। তাহা করিলেও তাহার বৈশিষ্ট্য যায় না। এক কাজ অনেকে করিলেই যে কাহারও বিশেষ কর্ত্তব্য চলিয়া যায়, অথবা কাহারও অস্তিত্বলোপের কারণ উপস্থিত হয়, এমন কথা কেহই বলিতে পারে না। বহু জন বহু দিক হইতে এক কাজ করিলেও, আরও অনেক দিক হইতে অপর অনেকের তাহা করিবার যথেষ্ট প্রয়োজন থাকিতে পারে। একে যে বৈশিষ্ট্য আছে, অপরে কিছুতেই তাহা সম্পূর্ণরূপে লক্ষিত হয় না, এই কথাই সকলে বলিবে। সুতরাং অপর কোনও লোক বা সমাজের দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজের কাজ সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইতে পারে না। তাহা করিতে হইলে, নামে না হইলেও, তাহাকে প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মসমাজেই পরিণত হইতে হইবে।

তাহার পর, অনেকে সহযোগিতার কথা বলিতে যাইয়া বলেন, অপরের সঙ্গে সর্ব্বাংশে মিল ও ঐক্য রাখিয়াই সব কাজ করিতে হইবে। তদতিরিক্ত পৃথক কিছু করিবার প্রয়োজন নাই, করিলে মিলন ক্ষুণ্ণ হইবে। অপরে যে-সকল কল্যাণকর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাহার সহিত সহযোগিতা করা যে কর্ত্তব্য তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সহযোগিতা করিতে যাইয়া যে পৃথক ভাবে তাহাদের অতিরিক্ত আর কিছু করা যাইবে না, এরূপ কথা কিছুতেই বলা যায় না। মিলিত হইয়া তাহাদের কার্য্যের সকল প্রকার সহায়তা করিয়াও তদতিরিক্ত অনেক অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকিতে পারে। ঐক্য বা মিলনের খাতিরেও তাহা অবহেলা করা যায় না—করিলে কাহারই কল্যাণ নাই। ব্রাহ্মসমাজ প্রথম হইতে তাহা করিলে যে দেশ কখনও বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারিত না, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বর্ত্তমানেও ধর্ম্ম জাতিভেদ প্রভৃতি ও কতকগুলি নীতিবিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে শুধু ঐক্য ও মিল রাখিয়া চলিতে গেলে যে কল্যাণ নাই, উন্নতির পরিবর্ত্তে দেশ অবনতির পথেই দ্রুত ধাবিত হইবে, তাহা সামান্য একটু চিন্তা ও বিচার করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। এ সকল স্থলে ব্রাহ্মসমাজকে কেবল ঐক্য ও মিল রাখিয়া কাজ করিতে গেলে শুধু আত্মহত্যাই করা হইবে না, দেশেরও সর্ব্বনাশই সাধন করা হইবে। এখানে তাহাকে ঐক্য ও মিলন-ভূমি অতিক্রম করিয়াও, অনেক দূর অগ্রসর হইতে হইবে,—অগ্রবর্ত্তী পথপ্রদর্শকরূপেই কার্য্য করিতে হইবে। শুধু ঐক্য ও মিলন খুঁজিতে গেলে কোনও প্রকারেই এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে না, সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য পালিত ও বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইবে না। সহযোগিতা করিতে যাইয়া ব্যক্তিত্ব হারাইলে চলিবে না। উপযুক্ত সীমার মধ্যে উভয়েরই যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। ভ্রান্ত উদারতার বশবর্ত্তী হইয়া ব্যক্তিত্ব লোপ করিয়া দিলে প্রকৃত সহযোগিতা হয় না—আত্মবিক্রয় বা দাসত্বই তাহার একমাত্র পরিণাম।

ব্রাহ্ম সমাজের ন্যায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজেরও একটা ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য আছে। উহা অতি উদার ও প্রশস্ত ভূমির উপরই প্রতিষ্ঠিত। উহার প্রকৃতিতে কোনও প্রকার সংকীর্ণতার স্থান নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সে উদারতা ও প্রশস্ততার যে কোনই সীমা নাই, উহা সর্ব্ব প্রকার বৈশিষ্ট্য ও আকারহীন একটা অনির্দ্দেশ্য বস্তু, যাহাকে অপর সকল হইতে পৃথক করা যায় না, চিনিয়া লওয়া যায় না, উহা যাহার সহিত মিলিত হয় সম্পূর্ণ রূপে তাহাই হইয়া যায়, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। একমাত্র কল্পনার রাজ্যেই এরূপ কোনও বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভবপর, বাস্তব জগতে নহে। সম্মিলন ও সহযোগিতা উহার একটা প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইলেও, তাহা নিজের বা অপরের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়া নয়, বরং পূর্ণ ভাবে রক্ষা করিয়াই সাধনীয়। মূল লক্ষ্য ভুলিয়া শুধু সম্মিলন ও সহযোগিতা কাহারও অবলম্বনীয় হইতে পারে না। তাহাতে কাহারও নিজের বা অপরের কোনও প্রকার কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। যে যতটা সদনুষ্ঠান করুক না কেন, তাহার সঙ্গে ততটা সহযোগিতা করাতে দোষ নাই বটে। কিন্তু যদি সেখানেই কেহ ক্ষান্ত হয়, যতটা সে নিজে করিতে পারে ততটা করিবার প্রয়াস না পায়, তবে তাহা উভয়েরই পক্ষে ক্ষতিকারক হয়, উভয়ের উন্নতি-সাধনেই ব্যাঘাত ঘটায়। যাহার যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য তাহা তাহাকে সর্ব্ব প্রথমে সম্পূর্ণ ভাবেই করিতে হইবে। কোনও প্রকার সাংসারিক সুখ সুবিধার জন্য, আরাম বা সংগ্রাম-নিবারণের জন্য, তাহাকে বিন্দু পরিমাণেও খর্ব্ব করিবার অধিকার তাহার নাই,—করিলে সকলের অকল্যাণ ভিন্ন কাহারও কোনও প্রকার কল্যাণই সাধিত হইতে পারে না। এই জন্য মিলন ও সহযোগিতা যতই বাঞ্ছনীয় হউক না কেন, তাহাই একমাত্র লক্ষ্যস্থানীয় হইতে পারে না। সে দিকে যথাসম্ভব দৃষ্টি নিশ্চয়ই রাখিতে হইবে, কিন্তু তদতিরিক্ত সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তাহার জন্য সতত যত্নশীল থাকিতে হইবে। অত্যধিক মিলনাকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত হইয়া যদি আমরা অপরের অপেক্ষায় বসিয়া থাকি, তবে আমাদের কর্ত্তব্যে অবহেলা ঘটিতে পারে, কার্য্যও কিছু পরিমাণে পণ্ড হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ যে সময় সময় ঘটিয়া থাকে, তাহার প্রমাণ অনুসন্ধান করিলেই পাওয়া যাইবে। অপর বিষয়ে বিরোধিতা উপস্থিত হইলেও, মিলন কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইলেও, আপনার বিশেষ কর্ত্তব্য করিতেই হইবে—তাহা কোনও অবস্থায়ই পরিত্যাগ করা যায় না, করিলে আত্মহত্যাই করা হয়, ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যাওয়া হয়। সকল বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করাই যে সর্ব্ব প্রধান

কর্ত্তব্য, সে দায়িত্ব হইতে যে কেহই কোনও অবস্থায় মুক্ত হইতে পারে না, সে কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্ম উদারতা ও মিলনাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সময় আমাদের বিশেষ কাজ ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে অনেকে ভুলিয়া যান। এবিষয়ে সকলেরই বিশেষ সাবহিত হওয়া আবশ্যক। আমরা যেন সর্ব্বদা একমাত্র মঙ্গলময় বিধাতার ইচ্ছানুসরণ করিয়াই আমাদের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারি, তিনি আমাদিগকে সেই বুদ্ধি ও শক্তি প্রদান করুন।

সকল মানুষই 'অমৃতের পুত্র কন্যা'।

উপনিষৎকার ঋষি বলেছিলেন—"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ⋯তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। এখানে ঋষি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে সেই মহান্ পুরুষকে জেনেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। তিনি যেন সাধারণ মানুষকে বল্‌ছেন—"অমৃতস্য পুত্রাঃ।" এই কথাটির মধ্যে প্রবেশ করা চাই। এরই কতকটা অনুরূপ কথা বাইবেলেও পাওয়া যায়। St. Paul তাঁর একটি epistleএ তাঁর সমবিশ্বাসীদিগকে বল্‌ছেন—"Fellow-citizens with the saints, and of the household of God"—"সাধুদের সঙ্গে সম-নাগরিক; ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত লোক"। এই ভাবটি আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখ্‌তে হবে।

আমরা দেখি, পরিবারের মধ্যে যদি পিতার প্রভাব থাকে, তবে সেই পরিবারের সকলের চরিত্র অনেকটা তাঁর মত হয়। আমরা যদি যথার্থই ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত লোক হই এবং ঈশ্বরের প্রভাব যদি আমাদের উপর থাকে, তবে আমাদের মধ্যে সাধুতা অবশ্যই থাকবে। আর, আমাদের যদি অমৃতের পুত্র হ'তে হয়, তবে সেই লক্ষণও আমাদের দৈনন্দিন কাজে প্রকাশ পাওয়া চাই। সেই লক্ষণ কি, তা আমরা সকলেই জানি; যদিও অনেকেই তা পালন করি না।

নাগরিক হওয়ার লক্ষণ কি?—হিতকর পৌর ও জানপদ নিয়ম পালন। একটা নগরের প্রত্যেক লোক যদি নিয়ম পালন না করে, তবে কোনও মিউনিসিপ্যালিটির সাধ্য নেই যে, সেই নগরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ্‌তে পারে। সাধুদের সঙ্গে সম-নাগরিক হওয়ার অর্থ—আমরা জ্ঞানে আলোকিত থাকব, আত্মাকে সুস্থ রাখ্‌ব; অন্ততঃ এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমরা সাধুদের সঙ্গে সম-নাগরিক, এ কথা স্মরণ রাখ্‌লে, আমরা ধর্ম্মকে জীবনে, পরিবারে, সমাজে, দেশে, মহাদেশে, জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব।

'অমৃতের পুত্র' আমরা নিজ নিজ যোগ্যতার দ্বারা হই নাই, কিন্তু এই অধিকার পেয়ে, চেষ্টাদ্বারা আমাদের যোগ্য হ'তে হবে।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে নিজের নিজের মুক্তির জন্য প্রবল প্রয়াস নানা ভাবে দেখা গিয়েছে; কিন্তু সবাই মিলে উন্নতি লাভ করতে হবে, এ ভাব কম ছিল। সব দেশেই এই ভাব কম ছিল। প্রাচীন এথেন্সে জ্ঞানের চর্চ্চা উন্নতির উচ্চ সোপানে উঠেছিল; কিন্তু সেই উন্নতি দাসত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কতক লোক উন্নত হয়েছিলেন; অন্যেরা হীন অবস্থাতেই রয়ে গিয়েছিল। এই ত্রুটি সব দেশেই এখনও রয়েছে। কিন্তু সকলেই 'অমৃতের পুত্র' এ কথা স্মরণ রেখে সর্ব্ব সাধারণের উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে হবে।

এই কথাটি স্বীকার করার মধ্যে দায়িত্ব রয়েছে। একজন 'উচ্চ' কুলে জন্মেছেন, আর একজন 'নীচ' কুলে জন্মেছেন; কিন্তু সত্য দৃষ্টিতে দেখ্‌লে উভয়ে ভাই। ভাইকে পশ্চাতে ফেলে এলে যথার্থ উন্নতি হয় না। বাইবেলে উক্ত আছে, ভ্রাতৃহন্তা কেইনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'তোমার ভাই কোথায়? সে উত্তর দেয়—"Am I my brother's keeper?"—"আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষক?" এরূপ কথা বল্লে চল্‌বে না। যতদিন সকলে উন্নত না হয়েছে, ততদিন কেউ সম্পূর্ণ উন্নত হ'তে পারে না। বোধিসত্ত্ব বলেছিলেন, "যত দিন না সব মানুষ মুক্ত হচ্ছে, ততদিন আমি নিজের মুক্তি চাই না।" যদি অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য না করি, তবে আমি যথার্থ ধার্ম্মিক হই নাই। অতএব সকলেই 'অমৃতের পুত্র' এবং 'সাধুদের সঙ্গে সম-নাগরিক', এই দুই বাক্যের মধ্যে যে মহত্ত্ব রয়েছে, তা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করা চাই।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর উৎসবে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের তাৎপর্য্য—কুমিল্লা, ৫ই অক্টোবর, ১৯৩২।

ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ।

এরূপ বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা বর্ত্তমান সম্মিলনীর ন্যায় মিশ্রিত সভায় হওয়া সম্ভব নয়। অতএব আমি কেবল বিষয়টির মোটামোটি আলোচনা করব।

ব্রাহ্মসমাজ তার আবেষ্টন হ'তে পৃথক্ নয়। আবেষ্টনের প্রভাব কোনও সমাজই অতিক্রম করতে পারে না। আমরা যদি মনে করি, নিজেরা পরিষ্কৃত স্থানে থেকে, স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করলেই, সুস্থ থাকতে পারব, তা হয় না। চারদিককেও পরিষ্কৃত রাখ্‌বার উপায় করতে হয়। এলাহাবাদে একটি ধনী লোক এক উৎকৃষ্ট পাড়ায় বাস করতেন; কিন্তু যখন প্লেগ আরম্ভ হ'ল, তখন যে সব গরীব লোক নিকৃষ্ট পল্লীতে অপরিচ্ছন্ন ভাবে বাস করে, তাদের বাড়ীতেও যেমন সেই রোগ দেখা দিল, তেমনি উক্ত ধনীর বাড়ীতেও দেখা দিল। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিকে হারালেন। আমি ভাল থাকব, বাকী লোকের যাই হোক্—এটা হয় না। আমাদের ছেলেপিলেদের উপরে চার দিকের প্রভাব আস্‌বেই। সুতরাং সকলেই যাতে ভাল হয়, তার চেষ্টা করতে হবে। ব্রাহ্মসমাজের জন্য যে আদর্শ, সকল সমাজের জন্যই সেই আদর্শ।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সম্মিলনীতে আলোচনাকালে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক উত্থাপিত আলোচনার সারমর্ম্ম—কুমিল্লা, ৬ই অক্টোবর, ১৯৩২।

কালকের উপাসনাতে আমরা ঋষির এই উক্তি স্মরণ করেছিলাম যে, সকল মানুষই 'অমৃতের পুত্র'। তা হ'লে আমরাও ত 'অমৃতের পুত্র'—মৃত্যুর অতীত। অনেক দেশে লোকে ধর্ম্মরক্ষার জন্য মৃত্যুকে বরণ করেছেন। কত লোককে মতভেদের জন্য অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়েছে; তাঁরা তবুও আপন বিশ্বাসের বিপরীত কথা বল্‌তে রাজি হন নি। আজকাল আর এইরূপ অত্যাচার হয় না; ধার্ম্মিকদের আর সেই দিক দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় হ'তে হয় না। কিন্তু তিলে তিলে দুঃখ বরণ কর্‌বার, মৃত্যু বরণ কর্‌বার দরকার হয়। এইরূপে মৃত্যুঞ্জয় হওয়ার আবশ্যকতা কেবল কতক লোকের জন্য নয়—সকলেরই জন্য। যার যে কর্ম্মক্ষেত্র, তাতে যদি তিনি মৃত্যুঞ্জয় হন, তবে তিনিই নীতিমান্। সকলে সকল কাজের যোগ্য নয়। কিন্তু যার যে কাজ, সেই কাজ বিশ্ববিধাতার ভৃত্য রূপে করা চাই; তাতে মৃত্যুঞ্জয় হওয়া আবশ্যক। এটাই নীতির সর্ব্বোচ্চ কথা।

হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠ্‌বার জন্য কেউ কেউ চেষ্টা করেন। তারও প্রয়োজন আছে। এর দ্বারাও অনেক কাজ হয়ত হবে। বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ যখন ঘুড়ি উড়িয়েছিলেন ও তদ্দ্বারা তাড়িতের আবিষ্কার করেছিলেন, তখন ত তিনি জান্‌তেন না, তাড়িতের দ্বারা কি কি কাজ হ'তে পারে। অথচ আজ তাঁর আবিষ্কৃত সেই তাড়িতের দ্বারা কত কাজ হচ্চে! আর, বিপদের জন্য বিপদকে বরণ করারও একটা ভাল দিক আছে। তাতে মানুষের সাহস ও দৃঢ়তা বাড়ে। এ দেশে শিশুকাল থেকে বিপদ্‌কে এড়াবার শিক্ষা দেওয়া হয়; এতে মানুষ নির্ব্বীর্য্য হয়ে যায়। কোনও কোনও জাতির মানুষ চিরকাল যুবা থাকে। তাদের দ্বারা বড় বড় বৈজ্ঞানিক কাজও হয়।

নৈতিক ও সামাজিক আদর্শ দুটা জিনিস নয়; একই জিনিস। Herd instinct অনেক লোকের মধ্যে থাক্‌লে তাদের প্রভাবে একজন সহজে ভাল কাজ কর্‌তে পারে; কিন্তু অনেক সময় এই herd instinct বা crowd mentality লোককে অধঃপাতিতও করে।

বেশীর ভাগ ছেলে যাতে আমোদ পাওয়া যায়, বা যাতে লোকপ্রিয় হওয়া যায়, তাই করে। কিন্তু সময় সময় কর্ত্তব্যের পথে একা দাঁড়াবারও দরকার হয়। তাতেই মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হয়।

নানা প্রকৃতির লোকের সঙ্গে মিশেও কি করে' ভাল থাকা যায়, এর কোনও সোজা পথ বলা যায় না। রোগের কারণ চার দিকে সকলেরই জন্য আছে; কেউ তাকে বাধা দিতে পারে, কেউ পারে না। নৈতিক রোগেরও কারণ চার দিকে থাক্‌বে; কিন্তু তাকে প্রতিরোধ কর্‌বার ক্ষমতা যাতে জন্মে, এমন শিক্ষা শৈশব হ'তেই দেওয়া দরকার।

ছেলেমেয়েরা যাতে মন্দ আমোদের দিকে না যায়, তজ্জন্য বিশুদ্ধ আমোদের বন্দোবস্ত করা দরকার। কিন্তু এটাও মনে রাখা উচিত যে, স্বাভাবিক কার্য্যের মধ্যেও যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়। বেশী হাস্য আমোদের বন্দোবস্ত করার আবশ্যকতা দেখি না। সিনেমায় বিদেশী চিত্রই অধিক দেখান হয়। নীতিবিরুদ্ধ চিত্র শিশুদের দেখান ভাল নয়। যাদের যথেষ্ট অবসর আছে, তাদের নূতন নূতন কাজ খুঁজে বার করা দরকার। মনোরঞ্জনের চেষ্টা কর্‌তে গেলে অধিক লোকের মনোরঞ্জন কর্‌তে হয়। তা হ'লে কি দাঁড়াবে বুঝ্‌তেই পারেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের বিশ্রাম (recreation) ছিল—Solving problems of Higher Mathematics. আমি পুত্রকন্যা বা পৌত্র পৌত্রীস্থানীয়দের জন্য আমোদের ব্যবস্থা কর্‌তে রাজি আছি; কিন্তু বিপদ্‌টা দেখিয়ে দেওয়া দরকার।

নীতির নিয়ম কি কি, তা জানা কিছুই কঠিন নয়। নীতির নিয়ম বাতাস জলের ন্যায় সুলভ। কিন্তু ভাল কথাও বেশী শুন্‌তে শুন্‌তে মূল্যহীন হ'য়ে যায়।

সংযম, আত্মশাসন দরকার। 'রাজ' শব্দের অর্থই হচ্চে—নিজে নিজের প্রভু হওয়া। আত্মশাসন ভিন্ন 'স্বরাজ' হয় না।

আজকাল মানুষকে নূতন নূতন কাজ কর্‌তে হচ্চে; নূতন নূতন বৃত্তি অবলম্বন কর্‌তে হচ্চে। সেই সম্পর্কে লোকের কাছে কথা দিতে হয়, অনেক সময় ঋণ কর্‌তে হয়। কথার খিলাপ না হয়, ঋণ পরিশোধ যথাসময়ে করা হয়, এ সব বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।

পূর্ব্বে ব্যবসা নির্ব্বাচন ব্রাহ্মেরা খুব সাবধানে কর্‌তেন। বাণিজ্যপ্রধান স্থানে নানা প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, অনেক ঋণ করে' দেউলিয়া হ'য়ে যাওয়া, ইত্যাদি চলিত আছে। এ সব বিষয়ে সাবধান হওয়া খুব দরকার।

ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব বহু-দেববাদের কুসংস্কার দূর কর্‌বার জন্য যেমন হয়েছিল, তেমনি দেশের নীতিকে উন্নত কর্‌বার জন্যও হয়েছিল। এ জন্য নীতির দিকে সকলেরই দৃষ্টি রাখা বিশেষ দরকার।

আজকাল নানা উপলক্ষ্যে পুরুষ নারীর মিলন পূর্ব্বাপেক্ষা বেড়েছে। তাতে যে বিপদ আছে, তাও কাজেই বেড়েছে। সে বিষয়ে সাবধান হওয়া দরকার। Lord Lytton ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে অসম্মানসূচক কোনও কথা বলেছেন ব'লে একবার কাগজে বেরিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে প্রশ্ন করে Lord Lyttonকে চিঠি লিখেছিলেন। তার উত্তরে Lytton এ দেশীয় নারীদের চরিত্রের উন্নত অবস্থা সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। নারীদের সেই গৌরব রক্ষা করা চাই। নারীদের চরিত্রে এমন শুচিতা ও গাম্ভীর্য্য থাক্‌বে, হাস্য-কৌতুকের মধ্যেও তাঁরা এমন সংযত ও পবিত্রতা দেখাবেন যে, কেউ কিছু অসৌজন্য প্রকাশ কর্‌তে সাহস পাবে না। ছেলেমেয়েদের মিলিত শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কোনও কৃত্রিম বাধা সৃজন কর্‌বার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। তিনি বলেছিলেন, আমাদের মেয়েরা নিশ্চয়ই তাদের সম্মান রক্ষা কর্‌বে।

হিন্দু সমাজে জাতিভেদ আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে ধনের ভেদে সামাজিক মর্য্যাদার ভেদ বেশী ছিল না। এখন সব দেশেই

ধনের দ্বারা জাতিভেদ হয়েছে। এটা দূর করা প্রয়োজন। আর একটা ভেদ আমাদের হয়েছে—ইংরাজী জানা ও ইংরাজী না জানার মধ্যে। এটা যত শীঘ্র দূর হয় তার চেষ্টা করা উচিত।

দেশে শিক্ষার বিস্তার দরকার। ক্ষমতা পেলে আমরা দশ বৎসরে দেশের নিরক্ষরতা দূর করতে পারি, যা শাসকেরা দেড়-শ বছরেও পারেন নি। কিন্তু সেই ক্ষমতা না থাকলেও আমরা কিছু করতে পারি। আমরা প্রত্যেকে অন্ততঃ একটি বালক বা বালিকাকে শিক্ষা দিতে পারি। অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান একটা ঋণপরিশোধ—অনুগ্রহ নয়। যাঁরা শিক্ষা পেয়েছেন শ্রমিক ও কৃষকদের প্রদত্ত অর্থেই পেয়েছেন। সুতরাং তাদের শিক্ষার জন্য কিছু করা ঋণপরিশোধের স্থায় কর্ত্তব্য কর্ম।

সকল শ্রেণীর লোককে উন্নত করে' সমাজকে গণতান্ত্রিক সমাজ করে' তোলা উচিত। সকল সম্প্রদায়েরই গণতান্ত্রিক হওয়া উচিত।

আজ কাল হিন্দুসমাজে অন্য সমাজ হ'তে আগত লোককে 'শুদ্ধি অনুষ্ঠান' ক'রে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বর্ণভেদ রেখে' এইরূপে অন্য সম্প্রদায়ের লোক গ্রহণ করবার কালে একটা সমস্যা এই দাঁড়ায় যে, যারা নূতন আসবে তাদের কোন্ বর্ণে ফেলা হবে। এ সকল স্থলে নানা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হয়। গারো নাগাদের হিন্দু ক'রে ক্ষত্রিয় বা অন্য কিছু বলে' আখ্যা দেওয়া হয়। আমরা ত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজে এই সমস্যার মীমাংসা কতকটা হয়েছে। কিন্তু এও এক সমস্যা। নারীদের দায়াধিকার সম্বন্ধে যাতে সুবিচার হয়, রামমোহন রায় তার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এখনও তা হয় নি। এদিকেও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে।

সকল সম্প্রদায়েরই নারীদের শিক্ষা এমন হওয়া উচিত, যাতে দরকার হলে' তাঁরা জীবিকা উপার্জ্জন করে' স্বাবলম্বী হ'তে পারেন। শুধু দরিদ্র মেয়েদেরই যে এটা দরকার, তা নয়; সকলেরই দরকার। 'আমি নিজে কিছু করতে পারি' এই ধারণা চারিত্রিক উৎকর্ষসাধনের জন্য প্রয়োজন।

মেয়েদের বিবাহের অসুবিধা সম্পর্কে 'কন্যাদায়' শব্দ ব্যবহার করা হয়। 'কন্যাদায়' কথাটাই কন্যাদের পক্ষে অপমানজনক।

আজকাল ভিন্ন সম্প্রদায়ের মেয়েদের এক সঙ্গে পড়তে হচ্ছে; ছেলেদের সঙ্গেও মেয়েদের পড়তে হচ্ছে। এখন তাঁদের চরিত্রের বর্ম্ম পূর্ব্বাপেক্ষা আরও শক্ত ইস্পাতের তৈরি হওয়া প্রয়োজন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের মিলতে হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রেও বিপদ আসবার পূর্ব্বেই সাবধান হওয়া উচিত। মেয়েদের চরিত্রের বর্ম্ম অভেদ্য হউক, আমি এই প্রার্থনা করি। ব্রাহ্মসমাজ নারীদের এই স্বাধীনতার জন্য পূর্ব্ব হ'তে কতকটা প্রস্তুত ছিলেন; হিন্দু সমাজ প্রস্তুত ছিলেন না। হিন্দু সমাজের নেতারা যেন এ বিষয়টা ভেবে দেখেন।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ হ'তে রক্ষা পেতে হ'লে, অন্য উপায় ত অবলম্বন করতেই হবে; সেই সঙ্গে টীকা নেওয়াও প্রয়োজন। নৈতিক রোগের আক্রমণ হ'তে রক্ষা পেতে হ'লেও সেইরূপ উপায় চাই। শিশুদের অনেক প্রলোভন নাই; বৃদ্ধদেরও অন্য কারণে অনেক প্রলোভন দূর হয়েছে। কিন্তু মধ্য-বয়সের অনেক লোক চিরদিনই থাকবেন এবং তাঁদের প্রলোভনও থাকবে। প্রলোভনের আক্রমণ হ'তে রক্ষা পেতে হ'লে, তাঁদের উচিত—জলন্ত ঈশ্বরবিশ্বাসের টীকা নেওয়া। যৌবনকে স্থায়ী করবার উপায় পবিত্রতার পথ অবলম্বন করা। ঈশ্বর-বিশ্বাসের টীকা নেওয়া সকল নৈতিক রোগের প্রতিষেধক।

বিবাহ-পদ্ধতি বিষয়ে ব্রাহ্ম যুবক-যুবতীদের আদর্শ রক্ষা।

বিবাহ সব সমাজেই দু' রকমে হ'য়ে থাকে—বন্দোবস্তের বিবাহ ও প্রীতির বিবাহ। কখন কখন এই দুই প্রণালীর মিশ্রণেও বিবাহ হয়। প্রীতির বিবাহ প্রবর্ত্তিত হ'লে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পাত্র পাত্রীর মধ্যে বিবাহ সময় সময় হবে। ব্রাহ্ম যুবক বা যুবতী যদি অন্য সম্প্রদায়ের যুবতী বা যুবকের সঙ্গে বিবাহিত হ'তে চান, তবে কোন্ পদ্ধতি অনুসারে বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হবে, এই প্রশ্ন। আমার মতে প্রত্যেকেরই নিজ ধর্ম্মের আদর্শে স্থির থাকা উচিত। ব্রাহ্ম যুবক বা যুবতীর যার সঙ্গে প্রণয় হয়েছে, তিনি যদি ব্রাহ্ম পদ্ধতি মতে বিবাহিত হ'তে বিবেক অনুসারে না পারেন, তবে উভয় পক্ষের উচিত চিরকুমার বা চিরকুমারী থাকা। ধর্ম্মের আদর্শ রক্ষার জন্য জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ অনেক লোকে করেছেন। তাই করা উচিত।

ব্রাহ্ম যুবক বা যুবতী যদি বিবেককে অগ্রাহ্য করে' সুবিধার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের অননুমোদিত অন্য সম্প্রদায়ের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করেন, অথচ যদি সেই বিবাহেরই উপলক্ষ্যে অন্য কোনও সময়ে উপাসনা করবার জন্য কোনও ব্রাহ্ম আচার্য্যকে ডাকেন, তবে আচার্য্য যাবেন কি না, তা তিনি বিবেচনা করবেন। এরূপ স্থলে দেখতে হবে উপাসনা সত্য ভাবে করা হচ্চে কি না, না কেবল লোক দেখান। আচার্য্য যদি দেখেন যে, কেবল সকল পক্ষকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই উপাসনার আয়োজন করা হচ্চে, তবে তাঁর না যাওয়াই উচিত। যদি ব্রাহ্ম যুবক বা যুবতী দুর্ব্বলতা বশতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে' থাকেন, তবে ক্ষমা করে' যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেই দুর্ব্বলতা সরল ভাবে স্বীকার করা চাই। ভগবান্ hard task-master; আবার তিনি ক্ষমাশীল। তিনি বার বার আমাদের ভাল হবার সুযোগ দেন; কিন্তু দোষ করলে কখনও শাস্তি হ'তে অব্যাহতি দেন না। বার বার সুযোগ দেওয়াই তাঁর ক্ষমা।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সম্মিলনীতে আলোচনা কালে সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মহাশয়ের মন্তব্যের তাৎপর্য্য—কুমিল্লা, ৬ই অক্টোবর ১৯৩২।

আচার্য্যের বা বন্ধুবান্ধবদের কোন্ স্থলে উপাসনায় যেতে হবে, কোন্ স্থলে যেতে হবে না, এ বিষয়ে কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করা যায় না।

আমাদের কন্যাদের ও পুত্রদের ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ রক্ষায় খুব দৃঢ় হওয়া উচিত। আদর্শ রক্ষার জন্য সকল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্জ্জন কর্‌তে প্রস্তুত থাকা উচিত।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ব্রহ্মমন্দির—নানা স্থানে পুরাতন ব্রহ্মমন্দির শূন্য প'ড়ে আছে—লোক নাই। আবার কোন কোন স্থানে নূতন ব্রহ্মমন্দির তৈরির জন্য আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ইট কাঠের মন্দির সার্থক হয়, যদি উপাসকমণ্ডলী থাকে। প্রকৃত মন্দির উপাসকগণের অন্তরে। সাত জন ব্রাহ্মনামধারী ব্যক্তি একটি ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ কর্‌বেন। ইহা একটা বড় কথা নয়—ইট কাঠ অর্থ সংগ্রহ ক'রে একটা মন্দির করা বিশেষ কঠিন কাজ নয়। কিন্তু তাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম দাঁড়ায় না, উপাসনা হয় না। তাঁদের অন্তরে মন্দির রচনা করেছেন কি? সেইটাই প্রধান চিন্তার বিষয়। অন্তরে অপ্রেম অমিল পুষে রেখে, উপাসনায় মিলিত হবার পথ বন্ধ ক'রে, মন্দির তৈরি কর্‌লে কি হবে? এতো পাগলামী?

এইরূপ পাগলামীর অভিনয় কত স্থানেই হচ্ছে! এ বিষয়ে সাবধান হ'তে হবে। অন্ধের মত কিছু একটা কর্‌লেই, ধর্ম্মচর্চ্চা হয় না, প্রচার হয় না। ব্রাহ্ম নামে পরিচিত কয় জন (৫।৬ জন) লোক এক জায়গায় আছি। উপাসনা করি, জাত মানি না, কুসংস্কার বর্জ্জন করেছি। ইহাই কি যথেষ্ট? আমরা সাধারণ মানুষ, সকলেরই দোষ ত্রুটি কিছু না কিছু আছে, সে জন্যে অপরাধ হয়। আমরা যদি পরস্পরের অপরাধ সইতে না পারি, ক্ষমা কর্‌তে না পারি, ব্রহ্মের নামে মিলিত হ'তে না পারি,—অহঙ্কারে অভিমানে স্ফীত হ'য়ে পরস্পরের নিন্দা করি, মুখদেখা বন্ধ করি, তা'হলে কি ব্রাহ্মধর্ম্ম রক্ষা হয়? সাধন হয়? প্রচার হয়? মন্দিরে কি হবে? মানুষ না হ'লে, মন্দির কি কর্‌বে? পাঁচ জন লোক কোনরূপে জড় করে হৈ চৈ করা এক কথা। তাতে ধর্ম্মসমাজ হয় না, ধর্ম্ম দাঁড়ায় না। এ বিষয়ে সাবধান হ'তে হবে।

নিজেদের মধ্যে মিল কর্‌বার চেষ্টা নাই, ক্ষমা নাই, সহিষ্ণুতা নাই। বাহিরের দশজন বিষয়াসক্ত ধর্ম্মবিমুখ লোক ডেকে, তাদের সভ্য ক'রে নিয়ে, ব্রাহ্মসমাজ করার চেষ্টা, বিকারী রোগীর প্রলাপের ন্যায় ব্যাপার। এতে ধর্ম্মের হানি হয়। ধর্ম্ম নিয়ে এরূপ ছেলেখেলা, গুরুতর অপরাধ।

যদি ইট কাঠের ব্রহ্মমন্দির তৈরি কর্‌বার সাধ থাকে, প্রথমে নিজের অন্তরকে, জীবনকে, পরিবারকে ব্রহ্মমন্দির কর, ব্রাহ্মধর্ম্ম-অবলম্বনকারী ভাই বোনদের সঙ্গে ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু প্রেমে মিলিত হও। তারপর, যারা ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল, ধর্ম্মই চায়,—অসত্য বর্জ্জন ও সত্য অর্জ্জন কর্‌তে চায়, এমন দু'চার জন লোককে সঙ্গে নিয়ে, উপাসকমণ্ডলী কর। তবে মন্দির সার্থক। নতুবা মন্দির ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা কর্‌বে না; দলাদলি অহঙ্কার ও হিংসার কথাই ঘোষণা কর্‌বে।

এ বিষয়ে ব্রাহ্মগণকে বিশেষ রূপ সাবধান হ'তে হবে। ব্রাহ্মসমাজের মিলনের বাণী আজ দেশের সর্ব্বত্র নানা ভাবে গৃহীত হ'তে আরম্ভ হয়েছে। ব্রাহ্মগণ নিজেরা যদি মিলিত হ'তে না পারেন, মহামিলনের কথা কোন্ মুখে বল্‌বেন? ব্রহ্মমন্দির মহামিলন-ক্ষেত্র। নিজেরা মিলিত হ'য়ে, সকলকে ডাক্‌তে হবে? তবে মন্দির সার্থক।

রাজা রামমোহন রায় ও সতীদাহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কুইস অব হেষ্টিংসের শাসনকালে সতীদাহের এক তালিকা সংগ্রহ করা হয়। কতকগুলি হিতৈষী লোকের চেষ্টায় ইহা সাধারণে প্রচারিত হয়, এবং পার্লিয়ামেণ্ট ও East India Companyর Directorদের সভায় এই বিষয়ে আলোচনা হয়। ইহাদ্বারা ইংলণ্ডীয় প্রজাবর্গ সতীদাহের বিষয় বিশেষরূপে জানিতে পারিলেন, এবং এই কুপ্রথাদমনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা রাজা রামমোহনের সতীদাহ নিবারণের প্রচেষ্টায় অনেকখানি সহায়তা করিয়াছিল।

পরে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই September তারিখে ব্যবস্থাপক সভার সহকারী সভাপতির আজ্ঞাক্রমে নিজামত আদালত হিন্দুবিধবাদের সহমরণ ব্যাপারে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্দ্ধারণ জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রচারিত করেন। কিন্তু ইহার দ্বারা কোন সুফল ফলিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। এই কুপ্রথা সেই সময়ের কুসংস্কারান্ধ সমাজের ধর্ম্মজ্ঞান উন্নত না থাকায় অতি ব্যাপকভাবে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সহিত অনুষ্ঠিত হইত। ১৮২৩ সালে পুলিশ বাংলা গভর্ণমেণ্টের কাছে এক বিজ্ঞাপনী উপস্থিত করে। তাহাতে জানিতে পারা যায় যে, বাংলা প্রেসিডেন্সিতে সহমৃতার সংখ্যা ৫৭৫ জনে দাঁড়াইয়াছিল। তন্মধ্যে ৩৪০ জন কলিকাতায় সহমৃতা হইয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয়, কলিকাতায় সহমৃতাদের যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত ঠিক, এবং দূরবর্ত্তী স্থানের যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা বাস্তব সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। বিশেষতঃ সেই যুগে দূরবর্ত্তী স্থানের সহমৃতাদের সংখ্যা ঠিকরূপে নির্দ্ধারণ করা অসাধ্য ব্যাপার ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই বিজ্ঞাপনী হইতে জানা যায় যে, এই কুপ্রথার গ্রাস হইতে বালিকা যুবতী প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা কেহই বাদ যায় নাই।

হিন্দুধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে বলিয়া রাজপুরুষগণ সতীদাহ-প্রথা লোপ করেন নাই। সেইজন্য এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে ইউরোপীয়গণ কি স্বদেশীয়গণ অনেকেই কিছু বলিতেন না। এমন কি খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক পাদ্রীগণও ইহার

রঙ্গপুর রামমোহন স্মৃতি-সভায় পঠিত।

বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না। তাহাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, সরকার বাহাদুর যখন ইহার বিরুদ্ধে কিছু করিতেছেন না, তখন ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলেই পক্ষান্তরে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে। এই আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক ছিল না। ডাক্তার জোন্‌স্ নামক এক সাহেব সতীদাহের বিরুদ্ধাচরণ করিলে, তাহাকে এই দেশ হইতে বিতাড়িত করা হয়; তাঁহারা ভাবিতেন, সতীদাহের প্রতিবাদ করিলে তাঁহারাও সেরূপে তাড়িত হইবেন। সুশিক্ষিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণও হিন্দুদের ধর্ম্মের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করা আবশ্যক, এই ধারণায় এই কুপ্রথা লোপ করিতে হস্তক্ষেপ করিতেন না। শিক্ষা ও জ্ঞানের নির্ম্মল আলোক লাভে এই নিষ্ঠুর প্রথা ক্রমশঃ রহিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের মত ছিল।

কিন্তু রাজা তাঁহার ভ্রাতৃপত্নীর সহমরণে এই ভয়ঙ্কর প্রথা রহিত করিবার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত প্রথা রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান নাই। উপদেশ, পুস্তকপ্রচার, গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শদান ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে তিনি ভারতভূমি হইতে এই নৃশংস সতীদাহ-প্রথা বিদূরিত করিবার জন্য অবিরতভাবে পরম উৎসাহে চেষ্টা করিয়াছেন।

আধুনিক যুগে হয় ত কেহ কেহ মনে করেন যে, সে-যুগে সহমৃতাগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চিতায় জীবন্ত দেহ ভস্ম করিতেন। কিন্তু কথাটা ঠিক নহে। দশ হাজার সহমৃতার মধ্যে একজনও সেই প্রকারে স্বাধীনভাবে জীবন বিসর্জ্জন করিত কি না সন্দেহ। চিতারূঢ়া সহমৃতার উপর আত্মীয় স্বজনেরা যথেষ্ট বল প্রয়োগ করিত। Fanny Parks নাম্নী এক সহৃদয়া ইউরোপীয় মহিলা এক পুস্তকে সতীদাহের এক অতিশয় হৃদয়বিদারক বর্ণনা করিয়াছেন। চিতারূঢ়া সতীর উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করা হইত, তাহা এই ঘটনা পাঠে অবগত হওয়া যায়। জে পেগস্ নামক জনৈক ইংরাজ বংশদণ্ড দ্বারা বলপ্রয়োগের কথা বলিয়াছেন। সহমৃতার দেহ মৃত স্বামীর দেহের সহিত শক্ত রজ্জুতে বন্ধন করিয়া বড় বড় বংশদণ্ড দ্বারা দুই দিকে চাপিয়া ধরা হইত—যেন চিতারূঢ়া সতী পলায়ন করিতে না পারে। সহমৃতার অভাবে তাহার যে সব আত্মীয়েরা তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইত, তাহারাই উক্ত নিষ্ঠুর কর্ম্মে অগ্রণী ছিল। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সহমরণ প্রথা স্বার্থ ও কুসংস্কারের পৈশাচিক-মন্দিরে শত শত অবলাকে বলি গ্রহণ করিত। সতীরা পতিশোকে অধীরা হইয়া প্রথমে সহমরণে সঙ্কল্প প্রকাশ করিত, পরে আর ফিরিবার উপায় থাকিত না। ফিরিলে দুরপনেয় কলঙ্ক; সঙ্কল্পের পর মত পরিবর্ত্তন হইলে সতীর স্বাধীনতার উপর জোরপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করা হইত। অনেক সময় সম্পত্তিলোভী আত্মীয়েরা মাদকদ্রব্য প্রভৃতি সেবন করাইয়া শোকাকুলা বিধবাকে উত্তেজিত করিয়া স্বকার্য্যসাধনে তৎপর হইত।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, সতীদাহের আনুষঙ্গিক অত্যাচারসকল নিবারণকল্পে নিজামত আদালত ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্দ্ধারণ জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রচার করেন। ইহা রহিত করিবার জন্য গোঁড়া হিন্দুরা গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংসের নিকট এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত আবেদন-পত্রের বিরুদ্ধে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংসের নিকট দ্বিতীয় আর এক আবেদন-পত্র উপস্থাপিত করা হয়। এই দ্বিতীয় আবেদন-পত্র রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ও উৎসাহে প্রেরিত হয়। ঐ আবেদনে কলিকাতাবাসী অনেক ভদ্রলোক স্বাক্ষর করেন, এবং প্রথম আবেদন-পত্র যে কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ দ্বারা প্রেরিত তাহা দ্বিতীয় আবেদন-পত্রে অস্বীকার করা হয়। সতীদাহের আনুষঙ্গিক অত্যাচারদমনের জন্য যে সকল নিয়ম প্রচার করা হয়, এই দ্বিতীয় আবেদন-পত্রে সেই সকলকে ন্যায্য ও একান্ত আবশ্যক বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এই আবেনপত্র প্রেরিত হয়। সতীদাহ বিষয়ক রাজার প্রথম পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ ইহার তিন মাস পরে প্রকাশিত হইল।

রাজা রামমোহন সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে ইংরাজি ও বাংলা ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে পুস্তক রচনা করিয়া তাহা নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া দেশের সর্ব্বত্র বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে রাজা সতীদাহ বিষয়ে তিনখানি পুস্তক প্রচার করেন। প্রথম দুইখানি দুই ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথনের সাহায্যে লিখিত হইয়াছিল। প্রথম পুস্তকের নাম 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের প্রথম সংবাদ।' দ্বিতীয় পুস্তকের নাম 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ।' বিপ্রনাম ও মুগ্ধবোধচ্ছাত্র নামধারী দুই ব্যক্তির পত্রের উত্তরে তিনি তৃতীয় পুস্তক লিখিয়াছিলেন। প্রথম পুস্তক ১৮১৮ সালে লিখিত হয় এবং ঐ সালে ৩০শে নভেম্বর উহা ইংরাজিতে অনুবাদিত হয়। দ্বিতীয় পুস্তক ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পুস্তকের ইংরাজি অনুবাদ রাজা লর্ড হেষ্টিংসের সহধর্ম্মিণীর নামে উৎসর্গ করেন। গভর্ণমেণ্ট ও বিশেষ করিয়া রাজপুরুষদের মত পরিবর্ত্তনের জন্য রামমোহন রায় তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক উভয়েরই ইংরাজি অনুবাদ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। ১৮৩০ সালে রাজার সহমরণ বিষয়ক তৃতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়।

এই তিনখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া রামমোহন সতীদাহ যে নিন্দনীয় অপধর্ম্ম তাহা প্রমাণ করেন। বলপ্রয়োগ যে গুরুতর পাপ তাহাও এই পুস্তকত্রয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি আরও প্রমাণ করেন যে, সমস্ত শাস্ত্রেই কাম্য কর্ম্ম নিন্দিত হইয়াছে। সহমরণ কাম্যকর্ম্ম, যেহেতু স্বামীর সহিত স্বর্গভোগ কামনা ব্যতীত স্ত্রীলোকের আত্মহত্যাতে কদাপি প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুসারে উহা অকর্ত্তব্য। তিনি বহু শাস্ত্র হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, সহমরণ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠ। এই তিন খানি পুস্তক ব্যতীত সতীদাহ

বিষয়ে তাঁহার সমুদয় যুক্তির সার উদ্ধার করিয়া ইংরাজি ভাষায় আর একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

১৮২২ অব্দে হিন্দু নারীর দায়াধিকার বিষয়ে রাজা যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহাতেও তিনি দায়াধিকার সম্বন্ধে অন্যায় ব্যবস্থা অনেক স্থলে সহমরণের একটি কারণ বলিয়া প্রমাণ করেন।

এই সকল পুস্তক পাঠে গোঁড়া হিন্দুদের স্থির রিপুর উত্তেজনা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল। তাহারা রাজার প্রতিবাদ করিয়া উত্তর বাহির করিলে, ঘোরতর তর্কযুদ্ধ চলিতে থাকিল। রাজার প্রতিপক্ষগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও নিরুত্তর হইল। রাজা সতীদাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচারে যে তিনটি বিষয় প্রতিপন্ন করেন তাহা এই :—

(ক) শাস্ত্রানুসারে পত্যনুগমন অবশ্য কর্ত্তব্য নয়। শাস্ত্রে এই বিষয়ে কোন আদেশ নাই, অর্থাৎ পত্যনুগমন না করিলে প্রত্যবায় হয় না।

(খ) সমস্ত শাস্ত্রেই কাম্যকর্ম্ম নিন্দিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য সহমরণ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।

(গ) শাস্ত্রের বিধানমতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে সহমৃতা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সহমৃতার উপর যথেষ্ট বল প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং ইহা নারীহত্যা। সেইজন্য এই প্রথা উঠাইয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

রাজার বিপক্ষগণ বলিতেন যে সহমরণ দেশাচার, বহুদিন যাবৎ ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহাতে কোন দোষ নাই। রাজা উত্তরে বলেন যে, যাহার ধর্ম্ম ভয় আছে সে নরহত্যা ও চৌর্য্যাদি কর্ম্ম পরম্পরা হইয়া আসিতেছে বলিয়া তাহা সমর্থন করিবে না। শাস্ত্রবিরুদ্ধ দেশাচার মান্য করিলে, বনস্থ ও পার্ব্বতীয় অসভ্য জাতিদের নরহত্যা দস্যুতারও সমর্থন করিতে হয়। কিন্তু তাহা কদাপি যুক্তিযুক্ত নহে। অবলাকে স্বর্গের লোভ দেখাইয়া বন্ধনপূর্ব্বক হত্যা করা, দেশাচার হইলেও, শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া গুরুতর পাপের কার্য্য।

রাজা রামমোহন স্বভাবতঃ অতিশয় দয়ালু লোক ছিলেন। সুতরাং সতীদাহ ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট কষ্ট অনুভব করিতেন। তিনি কেবলমাত্র পুস্তক প্রকাশ করিয়া ও প্রতিবাদীদের সহিত তর্ক করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া সহগামিনী রমণীর সহগমননিবারণে চেষ্টা করিতেন। এই প্রকারে তিনি একবার একটী রমণীকে সংগমন হইতে নিবৃত্ত করিতে গিয়া সহমৃতার আত্মীয়গণকে নানা প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহার আত্মীয়গণ ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিল, "হিন্দুর কর্ম্মে মুসলমান কেন?" রাজা ইহাতে বিচলিত হইলেন না, কিন্তু তাহার ভৃত্য রাগিয়া উঠিয়াছিল। আর একবার কালীঘাটে কয়েকটি নারী সহমৃতা হইবেন জানিয়া রাজা তথায় উপস্থিত হইয়া তাহা নিবারণের চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

১৮২১ সালে রাজা রামমোহন সংবাদ-কৌমুদী নামে যে পত্রিকা প্রকাশ করেন, তাহাতে সহমরণের বিরুদ্ধে প্রস্তাবসকল প্রকাশিত হইত। সতীদাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রকাশ হইলে ১৮১৯ সালে গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটে রাজার সম্বন্ধে এক প্রশংসাপত্র বাহির করেন। ১৮২২ অব্দে পুনরায় ইণ্ডিয়া গেজেটে রাজার বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয় :—

"এদেশীয় অতি প্রধান এক বিশ্বহিতৈষী ব্যক্তি অনেক দিন হইতে সভ্য রাজপুরুষগণের সাহায্যকারী এবং মনুষ্যজাতির হিতকারীরূপে এই গুরুতর বিষয়ে (সতীদাহ) নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি উৎসাহ সহকারে এ বিষয়ে তাঁহার মতামত পত্রের আকারে গবর্ণর জেনারেলের সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন। অল্পদিন হইল তিনি গভর্ণর জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি মহা অভ্যর্থনা সহকারে আগ্রহের সহিত তাঁহার কথা শ্রবণ করেন। আমরা জ্ঞাত হইলাম, গবর্ণর জেনারেল তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তিনি এই প্রথা রহিত করিবেন। কারণ ইহা আমাদের প্রজাবর্গের চরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্ক। আর, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সমর্থন করিতেছেন বলিয়া, ঐ প্রথায় রাজপুরুষগণের কলঙ্ক প্রকাশ পাইতেছে।"

লর্ড আমহার্ষ্টের সময়ে পুনরায় সতীদাহ বিষয়ে রাজার চেষ্টায় রাজ নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। লর্ড আমহার্ষ্টের পূর্ব্বে এবিষয়ে যে সব বিধি নিয়ম ছিল তাহা ইহার অন্তর্গত করা হয়। রামমোহন রায়ের অদম্য উৎসাহ ও প্রাণপাত চেষ্টায় এক্ষণে কতিপয় রাজপুরুষ ও দেশীয় লোক সহমরণ-প্রথা যে শাস্ত্রীয় কর্ম্ম নহে এবং উহা যে নিতান্ত নিষ্ঠুর ও নৃশংস প্রথা, তাহা বুঝিতে পারিলেন। ১৮২৭ সালে বেলি ও হ্যারিংটন সাহেব এই প্রথা রহিত করিবার জন্য মন্তব্য প্রকাশ করেন, এবং এই মন্তব্য ব্যবস্থাপক সভার সহ সভাপতি কেম্বারমিয়ার সাহেব কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়। কিন্তু লর্ড আমহার্ষ্টের শাসনকালে এই প্রথা রহিত হয় নাই। ১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন। সে সময়ে সতীদাহের পক্ষ সমর্থন করিয়া একশত পৃষ্ঠার এক পুস্তক প্রকাশিত হয়। রাজা পুনরায় যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা তাঁহার স্বদেশবাসী অনেক লোককে সতীদাহ প্রথা যে ন্যায় ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সতীদাহ প্রথা উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করিতেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইবে এবং বিদ্রোহিতা উপস্থিত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেন। ১৮২১ সালে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় যে তর্ক হয় তাহাতে ক্যানিং সাহেব এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন। সুতরাং এদেশীয় রাজপুরুষগণের ও ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞগণের ইচ্ছা থাকিলেও, এই কুপ্রথা দমন হয় নাই। রাজার প্রাণপাত চেষ্টায় অনেকে সতীদাহ যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও অন্যায় কার্য্য তাহা বুঝিতে পারিল। রামমোহন একদিকে যেমন দেশের লোককে বুঝাইলেন যে সতীদাহ প্রথা রহিত হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ

আবার অন্যদিকে গভর্ণমেণ্টকে বুঝাইলেন যে সতীদাহ-প্রথা শাস্ত্রানুমোদিত নহে, ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলে হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

রাজার লিখিত ইংরাজি ও বাংলা পুস্তকসমূহ সতীদাহ নিবারণের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিল। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিষ্ক উক্ত প্রথা ভারতভূমি হইতে ১৮২৯ সালে বিদূরিত করেন। রাজার বহুদিনের সঞ্চিত আশা সফল হইল এবং তাঁহার বাল্যকালের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল।

সতীদাহ নিবারিত হওয়ায় ধর্ম্মসভার ক্রোধ, ক্ষোভ, বিদ্বেষ ও ঘৃণার সীমা পরিসীমা রহিল না। ধর্ম্মসভা কেন সমস্ত ভারতবর্ষে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। রামমোহন রায়কে সকলে গালি বর্ষণ করিতে লাগিল, এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হইল। কেহ কেহ তাঁহাকে হত্যার ভয় দেখাইলেন। রাজার পক্ষে অতি সঙ্কট কাল উপস্থিত হইল। রাজার বন্ধুগণ রাজাকে সাবধান হইতে বলিলেন এবং বাহিরে যাইবার সময় প্রহরী সঙ্গে লইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয়ে একাকী রাজপথে ভ্রমণ করিতেন। তবে বাহির হইলে পোষাকের নীচে কিরিচ রাখিতেন।

১৮৩০ সালে রাজা রামমোহন রায় বন্ধুগণ সহ টাউন হলে এক সভা আহ্বান করিয়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে এক অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নামের সহিত রাজার নাম অতীত-সাক্ষী ইতিহাস চিরদিন কীর্ত্তন করিবে।

সতীদাহ রহিত করিয়া আইন বিধিবদ্ধ হইল বটে, কিন্তু ধর্ম্মসভা চুপ করিয়া রহিল না। সতীদাহনিবারণের আইন রহিত করিবার জন্য বিলাতে আপীল করা হইল। ইহাতে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যোগ দিলেন। এই সতীদাহনিবারণ আইনের সমর্থন করা রাজার বিলাত গমনের একটি উদ্দেশ্য বলিয়া জানা গিয়াছে। ধর্ম্ম-সভার এই আন্দোলন কোন ফল প্রসব করে নাই। ইহাও রাজা রামমোহনেরই চেষ্টার ফল।

রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ সম্বন্ধে এই সুমহৎ কর্ম্ম চিরদিন তাঁহার গৌরব ও কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধতাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া অজেয় সাহস ও উৎসাহ লইয়া তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন, এবং সুফল লাভ করেন। এই মহৎ কার্য্যের জন্য তিনি অসামান্য পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করেন। তজ্জন্য ভারতবর্ষ চিরদিন তাঁহাকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে।

জ্যোৎস্নাময় দাসগুপ্ত

সাধু নবদ্বীপচন্দ্র দাসের সঙ্গে—প্রচারে।

(স্মৃতি হইতে)

পরলোকে যাইবার ট্রেণ আসিয়াছে যেন দেখিতেছি; আর, প্রথম ঘণ্টার শব্দও যেন কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তাও যেন বোধ হইতেছে। তাই আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, জীবনে আর যাহা কিছু করিতে পারি, তাহা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ফেলি, এই ইচ্ছাই এখন প্রবল ভাবে আমার মনকে অধিকার করিতেছে। কিন্তু বিধাতার নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। শুনিয়াছিলাম যে, এক দার্শনিক পরলোক যাইবার পূর্ব্বে পরলোকের দূতকে আর কিছুকাল এ ধরণীতে তাঁহাকে জীবিত রাখিতে বলিয়াছিলেন, কারণ, ইতিহাস বিষয়ে তাঁহার আরো কিছু লিখিবার বাকী আছে। তদুত্তরে পরলোকের দূত বলিলেন,—"না, তা আমি কর'তে পারি না, কারণ, আবার যখন তোমাকে নিতে আসিব, তখন তুমি আবার ঐরূপ কথা ব'লে, আরো কিছুকাল এখানে থাকিবার বাসনা প্রকাশ করিবে। আমি তোমাকে আর ছাড়িব না।" এই কল্পনা-রচিত বিষয়টি যেন আমাদের অফুরন্ত বাসনা বিষয়ে, সকলেরই জীবনে সাক্ষ্য দান করিতেছে।

ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণকামী ব্যক্তিদিগের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া, যদি আমি নবদ্বীপচন্দ্র দাসের বিষয়ে ক্ষান্ত থাকি, তাহা হইলে, এই শ্রেণীর লেখা আমার অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল মনে করিব; আর মনে করিব যে, আমি নামজাদা লোকদিগকেই আদর করিতে শিখিয়াছি, প্রকৃত সাধুতার মূল্য এখনও ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই। যাঁহার বিষয় আজ যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে যাইতেছি, তাঁহার একখানি জীবনচরিত রচনা করিয়া ঢাকা নিবাসী আমার স্নেহের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর, আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আমি আজ তাঁহার বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিব। এটা কেবল সেই পরলোকবাসী পুণ্যাত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ মাত্র। নবদ্বীপ সাধু পুরুষ (Saint) ছিলেন। আর তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক রূপে সকল নরনারীর যেরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রায় উহার অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাসের মধ্যে, দুই একজন ব্যতীত, অন্য কোন প্রচারকের ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পাণ্ডিত্য লোকের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে—লোকের কণ্ঠ হইতে প্রশংসার ধ্বনি উত্থিত করে; কিন্তু বিনয়, ভগবদ্‌প্রীতি, স্বার্থত্যাগ, নরনারীর চিত্ত আকর্ষণ করে,—মানব হৃদয়ের ভালবাসার ও শ্রদ্ধার ধারা প্রধাবিত হয়। নবদ্বীপ তাঁহার মস্তিষ্ক অপেক্ষা, বিনয়, ভগবদ্ভক্তি ও পরার্থপরতার গুণে সমাজের বহু লোকের মনে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—লোকের ভালবাসা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তখন কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন হইয়াছে, অথবা মন্দিরনির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে কি না ঠিক বলিতে পারি না। সে সময় ৪৫নং বেনিয়াটোলাস্থ একটি পুরাতন সুবৃহৎ ভবনে,—এখন যে স্থানে সিটিকলেজের খ্যাতনামা ডাঃ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, এম, এ, মহাশয়ের নবনির্ম্মিত ভবন দণ্ডায়মান—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইত। ঐ বাটীর মধ্যস্থিত প্রাঙ্গণের বামপার্শ্বের দোতালায় একটি ছাত্র-নিবাস

ছিল; অন্যান্য গৃহের মধ্যে সমাজের আপিস প্রভৃতির কার্য্য হইত। আমি তখন উহারই একটি কুঠরীতে বাস করিতাম। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকের নীচের তালায় প্রশস্ত হলে নব-প্রতিষ্ঠিত সিটিস্কুলের প্রথম শ্রেণী বা এনট্রান্স ক্লাসের কার্য্য সম্পন্ন হইত; আর, সমাজের রবিবাসরীয় সায়ংকালীন উপাসনা, প্রাতে ছাত্রসমাজের অধিবেশন, ও বিবিধ সভা 'সমিতি', এ সকলেরই কার্য্য সে সময় তথায় চলিতেছিল। বলা বাহুল্য, সমাজের উপাসনা, ছাত্রসমাজে বক্তৃতাদান, সমাজের কর্ণধারস্বরূপ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, এম, এ, মহাশয় একাকীই পরিচালন করিতেছিলেন। বাটীর ঐ অংশের উপর তালায় সময়ে সময়ে সহরের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরাও বক্তৃতাদি প্রদান করিতেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ইনি সুপ্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (Rev. K. M. Banerjee)—তিনি এখানে একটি বক্তৃতা দান করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—"Buddha & Jesus". বুদ্ধের বক্তৃতা শুনিবার জন্য বহু লোক উপস্থিত হন। বক্তা উভয়ের চরিত্রের উচ্চ আদর্শ বিবৃত করিয়া বলিলেন, যে, শাক্য মুনি অসাধারণ ধর্ম্মসংস্কারক সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি ভগবদ্‌ বিশ্বাসী খৃষ্টের ন্যায় এ মধুর কথা বলিয়া যান নাই—"Love God, with all thy heart, with all thy mind &c". কৃষ্ণমোহন, এই জন্যই বুদ্ধ অপেক্ষা ধর্ম্মসংস্কার বিষয়ে যীশুর স্থান শ্রেষ্ঠ বলিয়াই স্বীকার করিলেন। আমিও এ বিষয়ে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে মনে মনে একমত হইয়াছিলাম। এখনও ঐ মতই পোষণ করি। রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সুললিত ইংরেজী ভাষায় বর্ণিত বক্তৃতাটি অতি মনোযোগের সঙ্গেই শ্রবণ করিয়াছিলাম, করিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করি। ঐরূপ গভীর জ্ঞানবিশিষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক আমরা কবে লাভ করিব? আমার মনে হইতেছে সেই দিনের কথা, যে দিন ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মানুরাগী, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারেচ্ছু যুবাপুরুষকে অর্থ দানে জ্ঞানার্জ্জনের সুবিধা প্রদান করিতেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত পুরাতন কার্য্যের বিষয় আমার নিকট এখন বড়ই সুখকর বলিয়াই মনে হয়, তাই বক্তব্য বিষয়ের বাহিরেই যেন আমার কলমের মুখ একটু দ্রুত ছুটিতেছে, এইরূপ যেন বোধ হইতেছে; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা অপ্রাসঙ্গিক নহে। এখন আসল কথার দিকে অগ্রসর হই। উল্লিখিত বেনিয়াটোলাস্থ ভবনের একটি গৃহে যখন আমি বাস করিতাম, তখন আমি সমাজের প্রচারকার্য্যে জীবন নিয়োগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। এজন্য কমিটি-নির্দ্দিষ্ট ইংরেজী ও বাঙ্গালা অনেকগুলি পুস্তক আমাকে পাঠ করিতে হয়।

তখন মধ্যাহ্নকাল অতীত হইয়াছে। আমি আমার গৃহে একখানি তক্তপোষের উপর বসিয়া পাঠ করিতেছি, এমন সময়ে একটি লোক একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ হস্তে লইয়া,—তাঁহার সঙ্গে বিছানাও ছিল—আমার গৃহে প্রবেশ করিলেন, করিয়া, এইরূপ ভাবের দুই একটা কথা বলিয়া সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিলেন—"আপনি যে কার্য্যে ব্রতী হইতেছেন, আমিও আপনার ন্যায় ঐ কার্য্য করিবার জন্য এসেছি।" আমি ক্ষণকাল এই অপরিচিত ব্যক্তির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। কিন্তু প্রথমেই বোধ হইল, লোকটি সহুরে নয়,—যেন কোন পল্লী হইতে আগত। যাহা হউক, নবাগত ব্যক্তি আমার গৃহের এক পার্শ্বে আপনার শয্যা বিছাইয়া, ব্যাগটি কাছে রাখিয়া, স্থির হইয়া বসিলেন। এইরূপ অবস্থায় অতি শীঘ্রই নীরবতা ভাঙ্গিয়া গেল; উভয়ের রসনাই খুলিয়া গেল, কথা আরম্ভ হইল। এই গ্রাম্য ভাবাপন্ন ব্যক্তিই নবদ্বীপচন্দ্র দাস। তখন বুঝিতে পারি নাই যে, এই লোকটি আপনার মধুর চরিত্রগুণে, স্বার্থত্যাগে, ও প্রচার-উৎসাহে, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ন্যায় এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বহু নরনারীর শ্রদ্ধাভাজন হইয়া, উহার বাল্য ইতিহাসে আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া যাইবেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের উভয়ের মধ্যে বেশ আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। বলিতে কি, আমি ইঁহার মধুর কথায় ও মিষ্ট ব্যবহারে বড়ই আনন্দ লাভ করিতে লাগিলাম; বেশ সঙ্গী পেলাম, এই মনে হইতে লাগিল। এই সপ্তপুষ্করিণী নিবাসী লোকটির ভিতরে সত্যই একটা অপার্থিব পরম জিনিষ লুকান ছিল, নতুবা কিসের প্রভাবে তিনি এত লোকের চিত্ত—কলিকাতায় ও মফঃস্বলে—হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? উহা আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব ভিন্ন অন্য কিছুই বলিয়া আমি ত বিশ্বাস করি না।

আমরা একত্রে বাস করিতে লাগিলাম। আমার মশারি ছিল না। নবদ্বীপচন্দ্র অতি শীঘ্রই একটি মশারিদানে, মশকের দংশন হইতে আমাকে রক্ষা করিয়া তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় দান করিয়া, আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইলেন। এক গৃহে বাস করিয়া, পরস্পরের মধ্যে বেশ একটা ঘনিষ্ঠতাই জন্মিতে লাগিল। আর, তাঁহার অমায়িকতা, হৃদয়ের কোমলতা, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা প্রভৃতি মহৎ গুণসকল দেখিয়া আমি বড় সুখী হইতে লাগিলাম। কিন্তু সকলের প্রকৃতি একভাবাপন্ন নহে। সৃষ্টির বিচিত্রতার ন্যায়, মানব প্রকৃতিও নানা ভাবের ও গুণের পরিচয় দান করিয়া, সততই আমাদিগকে চমৎকৃত করিতেছে। নবদ্বীপচন্দ্র খুব মিশুক লোক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের বাটী গমন করিতেন, সকলের খবর লইতেন। গৃহে বড় থাকিতেন না; সর্ব্বদাই যেন এখান ওখান করিয়া ঘুরিয়াই বেড়াইতেন। কিন্তু আমার প্রকৃতিটা, এক প্রকার তদ্বিপরীত বলিয়াই মনে হইত। তিনি যখন ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তখন আমি নির্জ্জনতা লাভ করিয়া, বিবিধ পুস্তকের সঙ্গেই অপার আনন্দ লাভ করিতাম। এই বাতিকটা, এই বৃদ্ধ বয়সে, অসুস্থ দেহে, চক্ষের কঠিন পীড়া সত্ত্বেও, এড়াইতে পারিতেছি না। মার্কিণ কবি লংফেলো যেন বলিয়াছিলেন, শুনিয়াছি, গ্রন্থরাজির বাতসটাও খুব ভাল।

যাক্ এ সকল কথা। কিছু দিন পরে নবদ্বীপচন্দ্র একদিন, একটু হাসিয়া আমায় বলিলেন, "দেখ, তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট, আমি তোমাকে "আপনি" বলিয়া কথা কই, কিন্তু তোমাকে আমি ছোট ভাইয়ের ন্যায় মনে করি, এজন্য আমি আজ থেকে তোমাকে "তুমি" বলিয়াই কথা বলিব।" আমি সস্নেহের কথা শুনিয়া যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইলাম, তাহা আর কি বলিব! আমি তাঁহার এই কথায় আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ সায় জানাইলে তিনি সুখী হইলেন; এবং তাঁহার প্রকৃতিগত একটু মধুর হাসি, হাসিয়া বলিলেন,—"তবে আজ থেকে তুমি আমাকে 'দাদা' বলিও।" আমিও তাঁহার এই কথায় বড়ই সুখী হইলাম, এবং তদবধি তাঁহার পরলোক-যাত্রার পূর্ব্বাবধি তাঁহাকে "নবদ্বীপ দাদা" বলিয়াই আসিয়াছি।

তাঁহাকে কেবল "দাদা" বলিয়াই ক্ষান্ত হই নাই। আমি অধিকাংশ সময় তাঁহার সঙ্গে প্রচারার্থ অনেক স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলাম। ঐরূপ ঘটনায় অনেক স্থলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিতাম, এবং সেইগুলি আমার সম্পাদিত 'ধর্ম্ম বন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশ করিতাম। তৎপর প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া, "সত্যদাসের সৎপ্রসঙ্গ" নামে যে একখানি পুস্তক প্রকাশ করি, সেখানি আমি নবদ্বীপচন্দ্র দাস দাদা মহাশয়ের নামে উৎসর্গীকৃত হইল, এইরূপ লিখিয়াই তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছি। ইহা তাঁহার প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধাঞ্জলির নিদর্শন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশি ভূষণ বসু

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২১শে নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুপ্রভাত হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে ৫১ বৎসর বয়সে বৃদ্ধ পিতা, পুত্র কন্যা ও পত্নীকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ২৬শে নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে সাধনাশ্রমের শিক্ষার্থী ট্রাবাঙ্কুর নিবাসী যুবক গোবিন্দ পিলে টাইফয়েড রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ৮ই অক্টোবর গিরিডি নগরীতে পরলোকগতা হেমাঙ্গিনী মজুমদারের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান পুত্র কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৬ই নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে বিশেষ উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শাস্ত্র পাঠ করেন। এই উপলক্ষে পতি শ্রীযুক্ত বামনদাস মজুমদার দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনাদান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ২৬শে নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী বীণাপাণি ও পরলোকগত দ্বারকানাথ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সিদ্ধনাথের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

দান—কুমারী কমলা মিত্র পিতা পরলোকগত জ্ঞানেন্দ্র লাল মিত্রের ১ম বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ২৲ টাকা, ও লাহোর ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। পরলোকগত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়ের চতুর্থ বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে পরলোকগত অধরচন্দ্র বসুর পুত্রগণ দাতব্যবিভাগে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই সমস্ত দান সার্থক হউক এবং পরলোকগত আত্মাসকল চিরশান্তি লাভ করুন।

প্রচার—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় গত ১০ই জুন মুর্শিদাবাদ জেলার বিন্দারপুর গ্রামে ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র রায়ের বাড়ী নানা দুর্য্যোগের মধ্যে রাত্রিকালে উপস্থিত হন। তিনি গোকুলবাবুর গৃহে বসিয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া প্রার্থনা করেন। ১১ই জুন প্রাতে উপাসনা করেন। অপরাহ্ণ হইতে গ্রামবাসীদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা ও সঙ্গীতাদি করেন। এই দিন রাত্রিকালে প্রায় ৭ মাইল দূরস্থ মীর্জাপুর গ্রাম হইতে ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাস আসিয়া এখানকার কার্য্যে যোগদান করেন। ১২ই জুন মধ্যাহ্নকালে গোকুল বাবুর ভ্রাতা কালাচাঁদ রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানোপলক্ষে বরদা বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ কালে গ্রামবাসীদের সম্মিলনে ধর্ম্মের নানা তত্ত্বসমূহ আলোচনা, প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি করেন। গোকুলবাবু এই পবিত্র অনুষ্ঠানোপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা দান করেন। ১৩ই জুন বরদাবাবু এখান হইতে ভাগলপুর যাত্রা করেন। ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে এক দিন আচার্য্যের কার্য্য করেন এক দিন সঙ্গতে আলোচনাদি করেন। এখান হইতে মুঙ্গেরে গমন করিয়া তথাকার ব্রহ্মমন্দিরে দুই দিন আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৭শে জুন কটকে গমন করিয়া উৎকল ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের উৎসবে যোগদান করিলেন। ৩০শে জুন সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে আলোচনা সভা হয়। এই সভাতে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে মহাত্মা রামমোহন ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রভাব সম্বন্ধে বলেন। ১লা জুলাই সায়ংকালে মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৩রা জুলাই এই উৎসবের শেষ দিন সায়ংকালে পুনরায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়া উৎসব শেষ করেন। ২১শে জুলাই জামসেদপুরের নিকট হলুদপুকুর নামক একটি স্থানে এক দিন বাস করিয়া উপাসনা ও সঙ্গীতাদি করেন। তথা হইতে চাইবাসা (সিংহভূম) উপস্থিত হইয়া ২৩শে জুলাই কথকতা করেন ও উপস্থিত ব্যক্তিগণের সহিত আলোচনা করেন। ২৪শে জুলাই চাইবাসা ব্রহ্মমন্দিরে মহাত্মা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তথা হইতে কলিকাতা আগমন করিয়া ২৮শে জুলাই বৃহস্পতিবার সায়ংকালে ব্রাহ্মসমাজ কমিটির মাসিক শেষ অধিবেশনে আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং পারিবারিক উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত করেন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ কর্ত্তৃক ১৫ই অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ.